ভবঘুরের বিলাত যাত্রা

ভূপর্য্যটক

রামনাথ বিশ্বাস

মিত্র ও ঘোষ

১০নং শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

এক টাকা আট [illegible]।

জীবন মরণ নিয়েই মানুষের পরমায়ু। এ সংসারে কারো সারাজীবন সুখে কাটে আর কেউ হা-হুতাশ করে জীবন কাটায়। গৌরীশচন্দ্র সিংহরায় তার প্রথম জীবন হা-হুতাশ করে কাটিয়েছিল। পরে যখন বুঝল এই হা-হুতাশের কারণ কি এবং সে কারণটাকে সরিয়ে দেবার জন্য উঠেপড়ে লাগল তখন দেখল তার শরীরের জীবনীশক্তি ফুরিয়ে গেছে। সেজন্য সে মোটেই দুঃখিত হয়নি বরং দুঃখ করতে নিষেধ করেছিল। পৃথিবী হ'তে হা-হুতাশ যাতে লোপ পায় তার উপযুক্ত ব্যবস্থার জন্য অনেককে বলেছিল। তার উপদেশ বাণী হতে আমিও বাদ যাইনি। আমার কর্মক্ষমতা ক্রমেই ফুরিয়ে আসছে সেজন্য তার ভ্রমণ কথা লেখেই সকল কাজের পরিসমাপ্তি করছি।

গ্রন্থকার।

গল্প তোমরা সবাই পড়েছ। কিন্তু এমন অনেক গল্প আছে যা পড়ার পর একবার সকলকেই ভাবতে হয়, কি পাঠ করলাম। অবশ্য আজ তোমাদের কাছে যা বলব তা ঠিক গল্প নয়। মাঝে মাঝে আমার ভ্রমণের স্বপ্নদৃষ্টিতে দেখি কত কি, আবার কখনও মনে পড়ে অতীতকালের কত কি কাহিনী। পারি না চুপ করে থাকতে, অবসর সময়ে সেই সব গল্প বলি। আমার জীবনের শেষের দিকটা কেমন করে কেটেছে তারই কথা বলছি। মরণ বোধ হয় আমার ঘনিয়ে এসেছে। আমি নাক দিয়ে আর শ্বাস ফেলতে পারছি না। মুখ দিয়েই শ্বাস নেওয়া এবং কথা বলার কাজ চলছে। অবিশ্যি মাথাটা এখনও খারাপ হয়নি। জ্ঞান ঠিক আছে বলেই আমার ধারণা। আমি সজ্ঞানে আছি কি জ্ঞান হারিয়েছি তা জানবার জন্য প্রায়ই দু' একটা অংক কষি। খবরের কাগজ পড়ি, রেডিওতে কলকাতার সংবাদ শুনি। আর যদি কোন বাংগালী ভদ্রলোক দয়া করে আমার দেশের কোনো সাপ্তাহিক অথবা মাসিক এনে দেন তবে তারও পাতা উল্টাই।

পৃথিবীর যত বড় বড় শহর দেখেছি, যত নদী সমুদ্র পেরেছি, যাত্রা পথের বিবিধ বিচিত্র অবস্থায়, তা ভুলিনি কিছুই। তার প্রত্যেকটার ছবি এখনও আমার স্মৃতি-পথে জাগ্রত, সুস্পষ্ট, সজাগ আছে। কি দেখেছি এবং কি করেছি তার অবিকল বর্ণনা আমার ঘরের অন্যান্য রোগীদের প্রায়ই শুনাই। যাঁর হাতে আমার পরিচর্য্যার ভার পড়েছে তিনিও আমার কাছে বসে এই ভবঘুরের দেশ ভ্রমণের কথা শোনেন এবং মাঝে মাঝে তার নোট বইয়ে কিছুটা লিখে নিয়ে যান।

আমার এ গল্প গল্প নয়, জীবন বেদ। আমার ভ্রমণ কাহিনী [illegible] বলতে পারলেই লিখি, কারণ যা দেখলাম [illegible]

চাই না, ভুলতে পারি না। থেকে থেকে মনে হয় পৃথিবীর তাবৎ লোককে যদি দেখাতে পারতাম—জগতের সকল দেশ! তা ত' হয় না। সে জন্য লিখতে চাই, বলতে চাই আমার কামনা বাসনার সেরা স্বপ্ন কি? প্রায়ই মনে হয় আমার এ লেখা কে ছাপাবে? এখানে যাদের সংগে আমার অন্তরংগতা তারা আমার লেখার দিকে একটুও তাকায় না। আমার এ দেশ-দেখা মনের সঙ্গে এদের কারও নেই পরিচয়, জানে না এরা যে মানুষের বাচার সার্থকতা কোথায়, এরা শুধু ভাবে আমার মৃত্যুর কথা। এরা এসেই আমার মুখের দিকে চেয়ে থাকে আর তার পরই মুখ ফিরিয়ে কেউ চোখের জল ফেলে আর কেউবা একটি কথাও না বলেই চলে যায়। তারা হয়ত ভাবে আমি আজই মরব বা পরেই মরব। তারা হয়ত ভাবে কি করে আমাকে কবর দেবার সুবন্দোবস্ত করবে।

তাদের হাবভাব দেখে আমি মনে মনে বলি আমার মরা-বাঁচার দায়িত্ব আমার হাতেই থাক, তোমাদের তা নিয়ে অত দরদ দেখাতে হবে না। মরবার জন্য পরোয়া কিছু নেই, কারণ মৃত মানব-শরীরের বেশ চাহিদা আছে। ইচ্ছা করেই এরা মৃত মানুষের শরীরের সেয়ার মারকেট করে না। যদি কেউ এই মাল নিয়ে লণ্ডনে একটি দোকান খোলে তবে সেই দোকানের সেয়ারের দাম বাড়ত ছাড়া কমত না। এটা ভারতবর্ষ নয় এটা ইংলণ্ড এবং বিশেষ করে লণ্ডন। এখানে লোক কুকুর বিড়ালের মত পথে-ঘাটে মরতে পারে না। এখানে লোক হাসপাতালেই মরে। যারা পথে-ঘাটে মরে তারা মরে দুর্ঘটনায়। অন্য কোন কারণে নয়।

আগেই বলেছি যে আমি আমার জীবনের জন্য পরোয়া করি না। শুধু ভাবনা আমার এই লেখা নিয়েই। লেখাটার কি গতি হবে

তাই নিয়ে আমি একটু চিন্তিত হয়েছিলাম, তবে আমার আশা ছিল একটু, তোমাদের ভবঘুরে রামনাথের সংগে আমার দেখা হবেই। হয়েও ছিল। তিনি সজ্ঞানে আমার কাছে আসেন নি, বিপদে তাকে ঠেলেছিল। [illegible] এখানে আসার জন্য তিনি বেশ পরিশ্রম করেছিলেন বিপদই তাঁকে আমার কাছে ঠেলে ফেলে দিয়েছিল। যাক্‌গে—তিনি কি করে আমার কাছে এসেছিলেন সে কথা তাঁর মুখ থেকেই তোমরা শুনে নিও। এখন আমার যা বলবার আছে তাই আগে শেষ করি। আকাশ পাতাল কত কি যে ভাবছি তার কুল কিনারা নেই, হঠাৎ মনে হ'ল কে যেন বলছে, "গৌরীশ ভাল আছ?"

তখন একবারও মনে হয়নি যে তোমাদের ভবঘুরে রামনাথ সত্যই আমার কাছে দাঁড়িয়ে আছেন। আমি ভাবছিলাম, হয়ত স্বপ্ন দেখছি। উঠে বসলাম।

একটা ভিজে রুমাল দিয়ে চোখ মুছলাম, তারপর ভাল করে চেয়ে দেখি সত্যি-সত্যিই সেই ভবঘুরে গম্ভীর হয়ে আমার কাছে দাঁড়িয়ে। অনেকগুলি রোগী তার দিকে চেয়ে আছে। আমি বললাম, তাকিয়ে আছে ওরা কিন্তু কেই বা জানে আপনার অস্থির বেঁটে পা দুখানার মূল্য। আপনার আগেই আমি দুবার পৃথিবী ভ্রমণ শেষ করে এখানে এসেছি। আপনি ভিক্ষা করে খরচ চালাচ্ছেন, আর আমি গতর খাটিয়ে পৃথিবী ভ্রমণ শেষ করছি। আসুন, বসুন, কাছে এসে বসুন।

তোমাদের ভবঘুরের হাতটা টিপে ধরে জিজ্ঞাসা করলাম নিশ্চয়ই কষ্ট হয়েছে?

ভবঘুরে হাসলেন, তারপর বললেন, তোমায় দেখে সুখী হলাম।

আমার মত অধমকে মানুষে যদি তাঁর হাতে চাপ দেয় তবে তার কি হতে পারে? কিছুই না, তবুও যখন আমি বললাম কষ্ট পেয়েছেন কি? তখন তার হাসাই উচিত ছিল। তিনি তাই করেছিলেন। সেদিন তার সংগে আর বিশেষ কোন কথা হয়নি তাই আগামী রবিবারে তাঁকে আসতে বললাম। মনে হল এতদিনে মনের মানুষ পেয়েছি। তিনি এসেও ছিলেন। তিনি শুধু একদিন আসেন নি, যতদিন লণ্ডনে ছিলেন সপ্তাহে দুবার করে আসতেন। ভগবান আজ আমার শেষ জীবনের আশা মেটাবার জন্য যাকে পাঠিয়ে দিলেন তাকে ত সহজে ছেড়ে দেব না। জীবনের সঞ্চিত যত অভিজ্ঞতা, তা সে যতটুকুই হোক আমি নিঃস্ব রিক্ত হয়ে দিয়ে দিতে পারি এমন মানুষ রামনাথ ছাড়া আর কেউ নেই। তাই তাঁকে আমার ভ্রমণ কাহিনী শুনিয়েছি। তিনি মন দিয়েই শুনেছেন। লেখাটা তাঁর কাছে দিয়েছি। তিনি বলেছেন, সময় পেলেই আমার ভ্রমণ কাহিনী তিনি নিজে লিখে ছাপাবেন। তিনি আমার ভ্রমণ কাহিনী নিশ্চয়ই ছাপাবেন, আর দেশের লোক তা পড়বে। আমি সেই আনন্দ নিয়ে মরতে পারব বলেই তোমাদের ভবঘুরে বিদায়ের বেলা অনেক কথাই বলেছিলেন। আমি বুঝতে পেরেছিলাম, এসব কথা ক্ষণস্থায়ী ভাব-প্রবণতার প্রভাবে তার মুখ হতে বের হয়নি। সত্যিকারের লোক সত্যি কথা বলেই আমার কাছ হতে বিদায় নিয়েছিলেন।

তোমরা অনেক লোককে মরতে দেখেছ, অনেককে চিরতরে বিদায় নিয়ে বিদেশে যেতে দেখেছ। মানুষকে কাঁদতেও দেখেছ। তোমাদের ভবঘুরে যখন আমার কাছ থেকে বিদায় নিয়েছিলেন,

তখন দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলেন নি, আর আমিও কাঁদিনি। আমরা হাসি মুখেই একে অন্যকে বিদায় দিয়েছিলাম। কেন আমরা হাসতে পেরেছিলাম জান? আমি আমার কাজ ঠিক ঠিক ভাবে করেছি সেই জন্যই মরতে অথবা চিরতরে বিদায় নিতে কোন দুঃখ হয়নি, আর তোমাদের ভবঘুরে তিনিও একজন কাজের মেশিন। কাজ করে যাওয়াই হল তাঁর জীবনের লক্ষ্য, অতএব তাঁর মুখও সদা-সর্বদাই হাসিতে পরিহাসে সজীব ও উজ্জ্বল থাকবে। কাজ করো দেখবে তোমরাও হাসতে পারছ, তোমরাও মরণকে ভয় দেখাচ্ছ, দেখতে পাবে যারা তোমাদের ভয় দেখাচ্ছে তারাই ভীত হয়ে পালাচ্ছে। দুনিয়াতে যদি বেঁচে থাকতে চাও, তবে মনে-প্রাণে সর্ব সাধারণের কাজ কর, দেখতে পাবে তোমরাও মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছ। তোমাদেরই কবি গেয়েছেন।

বল বীর উন্নত মম শির

... ...

এখন আমার আসল কথাটা বলি। আমার দেশ হল [illegible] জেলায়, আমি মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে। তখনকার দিনে [illegible] ঘরের ছেলের অনেক কর্তব্য ছিল। আমিও সেই অনে[illegible] পালন করতে বদ্ধ পরিকর হয়েছিলাম। ছলে-বলে কলে[illegible] পরিবারের গৌরব বজায় রাখাই আমার একমাত্র কর্তব্য ছিল। [illegible] কর্তব্য বজায় রাখতে গিয়েই বেশী আয়ের জন্য কলকাতায়, [illegible] ভেবেছিলাম কলকাতার পথে ঘাটে টাকা ছড়ানো রয়েছে। [illegible] যেদিন কলকাতায় আসলাম, দেখতে পেলাম কলকাতায় টাকা[illegible] [illegible] [illegible] মাটি ছড়িয়ে থাকত তবুও বেশ ভাল হত। কলকাতার [illegible] হতে দেখে মাথাটা বিগড়ে গেল, আমি [illegible] ঘরে [illegible]

জন্য চেষ্টা করতে লাগলাম। তখনকার দিনে ভদ্রলোকের পক্ষে ছোট-খাট চাকরি গ্রহণ করাটাও বদনামের কারণ ছিল। তখনকার দিনে বড় চাকরি মানেই ছিল কেরাণীর কাজ। আমি কিন্তু কেরাণী গিরিটা মনে-প্রাণে গ্রহণ করতে পারি নি। বিদেশে গেলে যদি অন্য কাজ সহজে পাওয়া যায় তার অন্বেষণে কলকাতার নানা যায়গায় ঘুরে বেড়াতে লাগলাম।

ভদ্রলোক অর্থাৎ কেরাণী শ্রেণীর মানুষেরা পাছে লোকের উপকার হয় এই আশঙ্কায় সর্বদা শঙ্কিত। তাই তাদের কাছে কোনো কথা জানতে চাইলে এড়িয়ে যায়, যাও বলে তা অতি সামান্য, তা হ'তে হদিস পাওয়া যায় না কিছুই। আমি কেরাণী মহলে বার বার চেষ্টা করেও বিদেশের কোন সংবাদ পেলাম না। যারা যুদ্ধে যাচ্ছিল তারা কি কাজে কোথায় যাচ্ছে তারও হদিস পাওয়া কষ্টকর ছিল [illegible] বেপরোয়া হয়ে খিদিরপুরের খালাসী মহলে যাওয়া-আসা [illegible] লাগলাম, একমাত্র আশা এই যে, ওরা ভদ্রতার মুখোস পরে না, [illegible] কথা বলতে ওদের সঙ্কোচ হবে না। আমার সে আশা মিথ্যা [illegible] কারণ ওরা সহজে মন খুলে দেশ বিদেশের কত কথাই বলত [illegible] তাদের অপূর্ব দেশ ভ্রমণ শুনতাম যখন তখন মনে হ'ত [illegible] তাদের সংগেই বিদেশে যাই না কেন। তাদের কাছ হ'তে [illegible] নিয়ে যখন ভদ্র সমাজে আসতাম তখন আবার মনের গতি [illegible] যেত। ভাবতাম এদের সংগে বিদেশে গেলে কি মান ইজ্জত [illegible] থাকবে? মান ইজ্জত বজায় রাখার জন্যই কলকাতায় এসেছি। [illegible] ইজ্জত যাতে বজায় থাকবে না সেদিকে যাওয়া কি উচিত? এই ভদ্রতা আর সত্যের দোটানায় কাটল কিছুদিন, তারপর একদিন খিদিরপুরে যাওয়া শুরু করলাম।

অনেক দিন চলে গেছে। বিদেশে যাবার আশা প্রায় মন হ'তে লোপ পেতে বসেছে। কলকাতায় থেকে কোনরকমে দিন কাটিয়ে পৈতৃক প্রাণটা যাবে যাবে করছে, এমনি যখন আমার শরীরের অবস্থা তখন দেখা হল আমাদের [illegible] ভদ্রলোকের সংগে। ভদ্রলোক বড়ই অমায়িক এবং দরিদ্রের বন্ধু। তাঁকে দেখে আমার মনের সাগর দোলার ঢেউ যেন উত্তাল হয়ে উঠল। মনে হ'ল এই বুঝি সময়, এ সুযোগ আর ছাড়া হবে না—আমাকে যেতেই হবে। কলকাতার এই নিত্যদিনের একঘেয়ে জীবন আর পারি না সইতে। বাইরের বিচিত্র জীবন-যাত্রার স্বপ্ন, দেশ দেখার কল্পনা কলম্বাস-মেগেলেন-ড্রেকের ইতিহাস, পৃথিবীর সমস্ত দেশের প্রতিচ্ছায়া যেন আমার এই জীর্ণশীর্ণ মনে হঠাৎ একঝলক প্রতিবিম্বিত হয়ে আমাকে পাগল করে তুলল। যাব আমি, যাবই। সে ভদ্রলোককে ভগবানের দুত ব'লে মনে হ'ল—আমি ধরে বসলাম, আপনি ত যাচ্ছেন, আমায় নিয়ে চলুন।

যাত্রা শুরু হল,—বঙ্গোপসাগর, আমাদের ঘরের সমুদ্র যাকে বলি সেই সমুদ্রে।

কলকাতা হতে যেদিন রওয়ানা হই সেদিন বিকালে [illegible] উঠেই পাকের বন্দোবস্ত করি! ভাজা মুগের ডাল, [illegible] ঝোল আর দেশী চালের ভাত পাক করেছিলাম। আমার সাথীদের সংগে ঠিক হয়েছিল, সন্ধ্যার পরই খাওয়া হবে। দেখতে দেখতে সন্ধ্যা হল। খাবার সময় হয়ে আসল। এদিকে জাহাজও বন্দর মোহনা ছেড়ে সাগরে পড়ল। জ্যৈষ্ঠ মাস সারাটাদিন গরমে খা খা করছিল। হঠাৎ দক্ষিণের আকাশে মেঘ দেখা দিল। মেঘ সাদাই ছিল, তারপর কালো হল। তার ঘনঘটায় আকাশ হ'ল অন্ধকার।

ঝড় উঠল। ঝড়ে জাহাজ কেঁপে উঠল, তারপর কি হল জানি না। ডেক থেকে নেমে এসে বিছানায় শুয়ে পড়লাম। মাথা ঘুরতে লাগল। পেটে কিছুই ছিলনা বলে বমি হল না, তবে উঠবার আর ক্ষমতা থাকিল না। খাবার ইচ্ছা হওয়া দূরের কথা খাবার কথা মনে হবা মাত্র শরীরটা যেন আরও খারাপ হয়ে যাচ্ছিল। নিজে হাতে রাঁধা ডাল ভাত আর মাছের তরকারী মুখের কাছেই পড়ে রইল। জীবনে যে আর কখনও খাবো এমন মনে হয় না, আশে পাশে যারা শুয়েছিল তাদের অনেকেই বমি করছিল। ঘণ্টা খানেক এরূপ দৃশ্য দেখার পর আপনি চোখ বুজে আসল, তারপর আর কিছুই জানি না। যখন চোখ খুললাম তখন দেখলাম আমাদের জাহাজ আর একটি গংগার মুখে মন্থর গতিতে চলেছে একটা পাগোডা সামনে রেখে। মনে পড়ে গেল সেই ডাল ভাতের কথা। আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ালাম। ডাল ভাতের অবস্থা দেখলাম, তারপর আর তার দিকে চাইতে ইচ্ছা হল না। আমার ভ্রমণের শুরুতেই রাঁধা ভাতে ছাই পড়ল। কুসংস্কার আমার মনে ছেয়ে বসল।

তারপর পিনাং সিংগাপুরের অনেক স্থানে অনেক বৎসর কাটিয়েছি, কেউ আমার মুখে হাসি দেখেনি। আমার সংগে যেন দুর্ভাগ্য ঘুরতো আর বলত তোমার রাঁধা ভাতে ছাই পড়ছে, তোমার জীবনে সুখ শান্তি নাই।

প্রায় নয় বৎসর মালয় দেশে কাটিয়ে মালয় এবং শ্যাম ভাষায় বেশ অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলাম। একটা চাকুরিও যোগাড় করেছিলাম, তাতে বেশ ভাল মাইনেই পেতাম, কিন্তু সেই প্রথম দিনের কুসংস্কার আমার মনে এমনি করে দাগ কেটেছিল, মনের শান্তি চলে গিয়েছিল আমি নিঃসংগ একাকী থাকতেই ভালবাসতাম। জীবনটা এক ঘেয়ে

হয়ে উঠেছিল, বেঁচে থাকতেও আর ইচ্ছা হ'ত না। খাওয়া এবং শুয়ে থাকা অথবা ঘুমের ঘোরে অচেতন হয়ে থাকা এই কয়টি কাজে কিন্তু কোনও দিক দিয়ে কম ছিল না। তবে কেন আমার এই দুর্দশা তার কারণ খুঁজে পাচ্ছিলাম না। আমার নিঃসঙ্গ জীবনের সবচেয়ে বড় অভিশাপ আর অশান্তির মধ্যে কি অজ্ঞাত রহস্য আত্মগোপন করে বাসা বেঁধেছিল তা এখন বুঝতে পারিনি।

শ্যামদেশের গভীর জংগলে

আমাদের দেশের লোকদের ভৌগোলিক জ্ঞান বড়ই কম সেজন্য তারা আফ্রিকার জংগলের কথাই বেশী করে বলেন। তারা জানেন না, আসামের উত্তর-পূর্ব সীমান্ত প্রদেশ হতে আরম্ভ করে ব্রহ্ম দেশের পশ্চিম দিকে এক নহর গভীর জংগলে পরিপূর্ণ পর্বতমালা হিমালয় হতে বের হয়ে ব্রহ্ম দেশের মধ্য দিয়ে ক্রমাগত চলে হঠাৎ সাগর জলে ডুব দিয়েছে। এই গভীর জংগলের বিশেষত্ব আছে বইকি। কোথাও পর্বতমালা বড় বড় গাছ-পালার মধ্য দিয়ে পার হয়ে হঠাৎ একটা জলাভূমিতে শেষ হয়েছে, আবার বিচিত্র বৃক্ষ-মালায় পরিশোভিত হয়ে দক্ষিণ দিকে ছুটে চলেছে। এই পর্বতমালার উপরিভাগে যেমন দামী দামী গাছ পালা দেখতে পাওয়া যায় তেমনি তার মাটির নীচে নানা রকমের মূল্যবান্ ধাতব পদার্থ পাওয়া যায়, এজন্যই মালয় উপদ্বীপ পৃথিবীর সেরা দেশ বলে গণ্য। কলকাতা হতে চলে আসবার পর আমি মালয় দেশের প্রায় সবটাই বেড়িয়ে নিয়েছি।

ছিলাম। এবার আমি এসেছি এমন এক স্থানে, যার সঙ্গে পৃথিবীর কোন সম্বন্ধ আছে বলে মনে হয় না। পুকিট নামক দ্বীপে তংকা বলে একটি বন্দর আছে। এই বন্দরে বৃটিশের পরিচালিত দু'খানা ষ্টিমার সপ্তাহে দু'বার করে যাওয়া-আসা করে। সেই জাহাজেই আমি তংকা বন্দরে এসে পৌচেছি। তংকা বন্দর আয়তনে চট্টগ্রামের সমান এবং ব্যবসায়ের দিক দিয়ে চট্টগ্রাম হতেও বেশী প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। তংকা হতে একটা বড় রাস্তা পূর্বদিকে আগিয়ে গিয়ে শ্যাম দেশের মেন্-ল্যাণ্ডের কাছে শেষ হয়েছে। ফেরিতে সেই ছোট প্রণালীটি পার হলেই আরম্ভ হয় বিস্তীর্ণ জলা-জংগল; যাকে আমি গভীর বলেই বর্ণনা করব। এখান হতে আরও পঞ্চাশ মাইল এগিয়ে গিয়ে একটি গ্রাম পাওয়া যায়, সেই গ্রামেই থাকতাম। গ্রামের চারিদিকে গভীর জংগল। সে জংলে জংগলী হাতি, বাঘ, সাপ এবং অন্যান্য সব রকমের নর-ঘাতক জীব-জন্তু বাস করে সন্ধ্যার পর এক ঘর হতে অন্য ঘরে যেতে হলে শুধু মশাল জ্বালিয়ে বের হলে নিরাপদ বলে মনে হ'ত না। কোনরূপ আগ্নেয়াস্ত্র সংগে থাকলে তবে অনেকটা নিরাপদ বলে মনে হ'ত। এরূপ স্থানে আসার জন্য আমার মন আরও খারাপ হয়ে গিয়েছিল।

দিনের বেলাতেও গ্রামটি আমার কাছে নিরব এবং নিস্তব্ধ বলেই মনে হত। এরূপ নিরবতা পেয়েও আমি দিনের বেলায় কোন বই পড়তাম না। রাত্রেই বই পড়াটা আমি পছন্দ করতাম।

১৯২৯ সালের জুলাই মাসের শেষ ভাগে আকাশ অন্ধকার। অবিরল ধারে বৃষ্টি পড়েছে। রাত্রি গভীর। কি একটা শব্দ [illegible] আমার ঘুম ভেংগে গেল। শব্দটা কোন দিক থেকে আসছে তা [illegible] [illegible] করে ফের শুয়ে পড়লাম। [illegible] হলে [illegible]

থেকে বার হয়ে চিৎকার করে জিজ্ঞাসা করতে এটা কিসের শব্দ হ'ল ? শ্যাম দেশে সেরূপ কেউ করেনা। শ্যাম দেশে এখনও সর্বসাধারণ তাদের ইচ্ছামত পিস্তল, বন্দুক, খাঁড়া এবং অন্যান্য নানা রকমের অস্ত্র ঘরে রেখে ব্যবহার করতে পারে। এতে চোর ডাকাতের যেমন সুবিধা আছে তেমনি অসুবিধাও আছে। লোকক্ষয়ের যেমন কারণ থাকে তেমনি লোকের সুখ সুবিধারও পথ খোলা থাকে। আমাদের দেশে যদি কোন ধনীলোক কোন গরীবকে সায়েস্তা করতে চায় তবে তার লোকবলের দরকার অতি অল্পই হয়। বিচারালয়ের সাহায্যেই তাদের শত্রুকে আইনের প্যাচে ফেলে জব্দ করতে হয়। ফলে যার পয়সা নেই, অন্যায়ের প্রতিবাদ করা পোষায় না। কিন্তু শ্যাম দেশে তা হবার উপায় নাই। মামুলী মজুর অথবা কৃষকও দরকার হলে অস্ত্রের সাহায্যে প্রবল পরাক্রান্ত শত্রুকে গোপনে হত্যা করে প্রতিশোধ নেয়। এই যে শব্দটা শুনতে পেলাম তা যদি সেরূপ কিছু হয় অর্থাৎ কেউ যদি কাউকে হত্যা করে প্রতিশোধ নিয়ে থাকে তবে সেই কাজে আমার নাক-গলানো কোন মতেই উচিৎ হবে না। এরূপ ক্ষেত্রে যারা নাক-গলাতে যায় তাদের নাকের বদলে ফুসফুস্ কেটে এবং এক ঝলক রক্ত মুখ থেকে বার হয়ে তারা চিরতরে সংসার হতে বিদায় নেয়। আমাদের বাংলা দেশে একটা প্রচলিত কথা আছে, সেই কথাটা হল "অমুক লোকটার পেশাই হল মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া"। শ্যাম দেশে তা হবার উপায় নাই। আজ যে লোকটা কারো বিরুদ্ধে অর্থাৎ মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়ে এল, কাল [illegible] [illegible]টা আর কোন মতেই নিরাপদ নয়। তাকে [illegible] [illegible] করতে হয় [illegible] এরূপ অনেক ঘটনা ঘটবে বলেই কেউ কারো [illegible] মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে সাহস করে না।

যাই হোক—ঘুম থেকে ওঠার পর সেই শব্দের কথা মনে হ'ল। সেজন্য তাড়াতাড়ি করে চায়ের দোকানে গেলাম। চা দেবার সংগে সংগেই ব'লল "তোমাদের মিষ্টার মরিশন আত্মহত্যা করেছে, একবার গিয়ে দেখে এসনা।" কথাটা শুনেই গত রাত্রের শব্দের তথ্য বুঝতে পারলাম! চা খাওয়া হয়ে গেলে মরিশনের বাংলাতে গিয়ে দেখলাম মরিশনের বন্দুক মরিশনের বুকের উপর পড়ে আছে আর মরিশনের মাথার খুলি উড়ে গিয়ে দেওয়ালে লেগে রয়েছে। ঘরটা রক্তে রক্তাক্ত হয়েছে। মরিশন আমাদের কোম্পানিতেই কাজ করত, সেজন্য আমার কর্ত্তব্য হল মরিশনের মৃত্যু-সংবাদ সিংগাপুরে জানানো। এসব কাজে যখন ব্যস্ত ছিলাম তখনই আমার দেখা হয় তোমাদের ভবঘুরে রামনাথের সঙ্গে। রামনাথও এদিকে এসেছিলেন সংবাদের কাজ নিয়েই। তাঁর সংগে কয়েকদিনের দেখা-সাক্ষাতের ফলে আমার মনের পরিবর্ত্তন হয় এবং তিনি আমাকে সিংগাপুরে ফিরে যাবার জন্য বার বার অনুরোধ করেন।

অপরের কাজ করলে নিজের ইচ্ছা মত কোথাও যাওয়া-আসা করা যায় না। সিংগাপুর ফিরে যাবার জন্য কয়েকবারই আবেদন নিবেদন করলাম। বার বারই আদেশ আসতে লাগল কর্মক্ষেত্র পরিত্যাগ করলে কাজ হতে ডিসমিশ করা হবে। বাংগালীর প্রাণই হল চাকুরি। সেই কাজ পরিত্যাগ করা আর শরীর হতে আত্মারামকে ঠেলে বার করে দেওয়া একই কথা। আমি কোন্‌টা করব তাই ভাবছিলাম। আর একটা চাকুরী যোগাড় করাও [illegible] সাধ্যাতীত ছিল। তখন ছিল মন্দ্র-কমাদোর যুগ। [illegible] [illegible] দল কিলবিল করছিল। [illegible] ঠিক করে [illegible] [illegible] না। আমার মনের [illegible] [illegible] প্রবলের [illegible]

বলেছি এখানে তার পুনরাবৃত্তি করা দরকার মনে করি না। তবে এই পর্য্যন্ত বল্তে পারি, আরও যদি দু'এক মাস এই জংগলে বাস করি তবে নিশ্চয়ই পাগল হয়ে যাব।

একেবারে নির্বান্ধব সঙ্গীবিহীন জীবনযাত্রার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হয়ত ঘটত—কিন্তু অধিকাংশই মানুষের মৃত্যু ও অপমৃত্যুর কাহিনী। এ ছাড়া বৈচিত্র্য কিছু ছিল না। একদিন ব'ল কি—আমি যে গ্রামে থাকতাম সে গ্রামের কাছেই একটা টিনের খনি ছিল। খনিতে অনেক চীন-দেশীয় মজুর কাজ করত। মজুরদের দল মাইন হ'তে বেশী দূরে বাস করত না। একদিন দুপুর বেলা যখন চীনা মজুররা বিশ্রাম করছিল তখন শ্যাম দেশের পুলিশ এসে মজুরদের [illegible] হানা দেয়। শ্যামদেশের পুলিশ অশিক্ষিতও নয় এবং [illegible]। তারা দোষী ব্যক্তিদের ধরার জন্য যখন ওয়ারেণ্ট বার [illegible]রে: কুলিদের নাম এবং অন্যান্য পরিচয় জিজ্ঞাসা করছিল [illegible] অনেকগুলি চীনা মজুরই জংগলের দিকে ধীর-পদবিক্ষেপে চলে যেতে থাকে। তা দেখে কতকগুলি পুলিশ পলাতকদের [illegible] যায়। যারা ধীর পদবিক্ষেপে চলছিল তারা বেশ দৌড়োতে [illegible]। পুলিশও তাদের পিছন নেয়। কিন্তু জংগল গভীর। একবার যদি কেউ গভীর জংগলে ঢুকতে পারে তাহ'লে তাকে খুঁজে বার করা ভয়ানক কষ্টকর কাজ। পুলিশের দলকে পলাতক চীনারা কোনরূপ আক্রমণ করেনি তবে হঠাৎ কোথা হতে খুব বড় বিষাক্ত সাপ পুলিশকে আক্রমণ করে। পুলিশ সাপের উপর গুলি ছুঁড়েছিল [illegible] সাপ মরল কি মরল না তার সন্ধান কেউ নেয়নি [illegible] দুটি লোক চৈতন্য হারায়। সাপে-কাটা [illegible] পাঠান হয়। তারা হাসপাতালে [illegible]

কি মরল তার খবর আমি নিতে পারিনি তবে যে সকল চীনা কুলি পালিয়েছিল তাদের কথা অনেকে দু'এক দিন আলোচনা করছিল এবং তাতে আমিও যোগ দিয়েছিলাম।

চীনাদের সংগে শত্রুতা করা বড়ই কঠিন কাজ, বিশেষ করে চীনা কুলিদের সংগে। এদের বাড়িঘর নেই বল্লেই চলে। তাদের প্রাণের মায়া যে আছে কিনা তাও অনেক সময় সন্দেহ হয়। তাদের একটা বিশেষ গুণ আছে। সেই গুণটি হল যাকে তারা যা বলে তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করে।

সিংগাপুর যাবার জন্য আমি অস্থির হয়ে পড়ছিলাম। এবার সিংগাপুর ফিরে যাবার সুযোগ পেলাম। পরের দিনই সকাল বেলা একজন খুনআইকে ডেকে এনে কোম্পানীর কাজ বুঝিয়ে দি[illegible] বেলার দিকে তংকা রওয়ানা হলাম। [illegible] পৌঁছতে [illegible] ঘণ্টা লেগেছিল। তংকা যখন গিয়ে পৌঁছলাম তখন রা[illegible] হবে। লোকজন প্রায় সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। হোটেল রেঁ[illegible] প্রায়ই খোলা। বড় পথটাতে শুধু বিজলী-বাতিগুলি আলো বি[illegible]ছিল। মোটর হতে নামবার পর দুজন চীনা এসে বলল "কুলিচাই কেরাণী" আমি তাদের আমার ট্রাঙ্ক এবং বিছানাটা হোটেলে [illegible] যেতে বললাম। হোটেলের মালিক দরজার কাছেই বসা ছিল। [illegible] নম্বর বলে দিল এবং হোটেলের একটা বয় আমার কুলি দুজনার সংগে গেল। বিছানা এবং ট্রাঙ্ক রেখে দিয়ে কুলি দুজন ফিরে [illegible]। কিন্তু মজুরী নিলনা। হোটেলের বয় ঘরের চাবিটা আমা[illegible] হাতে দেবারপর চাবিটা পকেটে ফেলে আমার পরিচিত এক [illegible] দোকানের দিকে অগ্রসর হলাম। খাবারের দোকানে [illegible] তখন অনেকগুলি স্ত্রীলোকের সংগে কি একটা হিসাব [illegible]

ঘরে বসে যখন আমি পাক করছিলাম তখন একজন চীনা আমার পেছন দরজা দিয়ে প্রবেশ করে এবং আমারই কাছে এসে বসে। অপরিচিত লোকটাকে দেখে যদিও আমার ভয় হল তবুও তাকে কিছুই বুঝতে না দিয়ে বললাম "তোমার কি চাই হে?" লোকটি অতিশয় বিনয় প্রকাশ করে বলল, "আমার পরিচয় দিয়ে তোমার কোন দরকার নাই, তোমার কাছে সাহায্য পাবার জন্য এসেছি, যদি সাহায্য করো তবে আমার বিশেষ পরিচয় পাবে।"

"আমি তোমাকে কি সাহায্য করতে পারি বল?"

"গত তিন মাস ধরে মাইনে পাচ্ছি না, সিংগাপুরে চলে যাবার চেষ্টা করছি তারই ভাড়ার যোগাড় হচ্ছে না।"

"আর্থিক দিক থেকে আমার কাছ হতে কোন সাহায্য পাবার উপায় নাই। এর পরেও যদি সাহায্য করার কিছু থাকে তবে [illegible] আমি আপ্রাণ চেষ্টা করব।"

লোকটা আমার আরও কাছে এসে বসল এবং বলল, "তোমার কাছ হতে আর্থিক সাহায্য আমরা মোটেই চাই না। আমাদের যদি তোমার কুলি বলে পরিচয় দিয়ে সিংগাপুর অথবা পেনাং পৌঁছাতে পারো তবে আমি তোমার দ্বিতীয় শ্রেণীর ভাড়াও [illegible] উপরন্তু [illegible] ডলারও নগদ দেব। কেমন তা হলেই ত তোমার [illegible]?"

আমি লোকটার মুখের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললাম, "তোমরা চোর নও?"

লোকটা আরও ধীরে বলল, "আমরা [illegible] হই আর [illegible] তাতে তোমার কি আসে যায়, [illegible] পাবে, দ্বিতীয় [illegible] পাবে আর যদি সিংগাপুরে গিয়ে [illegible] [illegible] না, যখনই তুমি আড্ডায় যাবে [illegible]

করব।" আমি চীনা লোকটির কথায় রাজি হলাম এবং তাকে বলে দিলাম আগামী কালই আমি তংকা যাব এবং সেখানে পৌঁছে কুলি চাই বলে তোমাদের আড্ডায় গিয়ে আমি বিজ্ঞাপন দেব। তাতে আমি বলব, এখান থেকে যে সকল কুলি আমার সংগে ইপো যাবে তাদের যাবার ভাড়া আমি দেব না, ফিরে আসার ভাড়া দেওয়া হবে। এখন আমায় টাকা দিয়ে বিদায় কর। লোকটি তার পকেট হতে তিনশত শ্যাম দেশের টিকেল আমার হাতে দিয়ে যে পথে এসেছিল সে পথেই বের হয়ে যাবার বেলা বলে গেল, তার নাম আ—হং।

সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠবার পূর্বেই অনেকগুলি সর্দার এসে [illegible] ভিড় করল। নীচে নেমে এসে তাদের সংগে দরদস্তুর করলাম। প্রত্যেক সর্দারকেই, কাজের দর সাধারণ অবস্থায় যা পাওয়া যায়, তার অর্ধেক বলতে লাগলাম। আমার কাজের দর শুনে কেউ কনট্রাকট নিতে রাজি হল না আমিও এদের কাছ থেকে রেহাই পেয়ে আ-হং-এর দেওয়া লিষ্ট অনুযায়ী আটজন চীনা কুলির পারমিট সংগ্রহ করার জন্য পাসপোর্ট আপিসে গেলাম। আপিসের অনেকের সংগেই আমার পরিচয় ছিল। পারমিট পেতে কোন কষ্ট হল না। পারমিট নিয়ে ফিরে এসে আমি লজিং হাউসে বিশ্রাম করতে লাগলাম। যখন আমি বিশ্রাম করতাম তখন লুংগি ব্যাবহার করতাম। লুংগি [illegible] খালি [illegible] বসে থাকাই আমার অভ্যাস তবে সেদিন গায়ে একটা গেঞ্জি [illegible] কাঠের চীনা-ধরনের খড়ম ছিল। ঘরের [illegible] [illegible] চেয়ার এবং টুল পাতা ছিল। আমি [illegible] [illegible] [illegible] ছিলাম।

বেলা তখন একটা হবে। বিষুবরেখার সূর্য্য-কিরণের উত্তাপ বেড়ে গিয়ে দক্ষিণ আকাশের এক কোণে মেঘমালা জমা হচ্ছিল। পাশের নারিকেল এবং সুপারী গাছগুলি গরমে কাহিল হয়ে উঠেছে। কলাগাছ গুলির পাতা এরই মধ্যে ঝরে পড়ছে। ইজি চেয়ারে বসে আমি তাই দেখছিলাম, এমন সময় একজন চীনা ভদ্রলোক এসে বললেন, এই ওঠ, সাহেব আসছেন। ইউরোপীয়ানদের এদেশে মালয় ভাষায় তোয়াণ বলে। আমি আর একটা দুষ্ট শব্দ না ব্যবহার করে নিজের দেশের শব্দ কথাটাই ব্যবহার করলাম। চীনাটা যখন বলল "সাহেব আসছেন, তুই এখান থেকে ওঠ" তখন আর ঠিক থাকতে পারলাম না। চীনাটাকে বললাম, তোর বাবাকে ডেকে নিয়ে আয়! এরই মাঝে একজন যুবক অষ্ট্রেলিয়ান আমায় সামনে এসে দাঁড়াল এবং হেসে জিজ্ঞাসা করল মিষ্টার এখানে থাকবার সুবিধা হবে?

নিশ্চয়ই হবে, বসুন এখানে। অষ্ট্রেলিয়ান, নিউজিলেণ্ডার, ইউরোপীয়ান এবং আমেরিকান মালয় দেশে তাদের হোটেলে সকলের সংগে ভদ্র ব্যবহার করে না। তারা যখন কোন মোটরকারে করে এক স্থান হতে অন্য স্থানে যায় তখন কোনও ইণ্ডিয়ান তাদের আগে যেতে পারে না। পাশ কাটিয়ে তারা আগে চলে যায়। এতে যদি কোন ব্যতিক্রম হয় তবে মোটরকারে মোটরকারে ধাক্কা লাগাতেও কসুর করে না। তার ফলে যদি কোন ইণ্ডিয়ান [illegible] চীনা মরে তবে কেউ একটুও দুঃখ প্রকাশ করে না। ইউরোপীয়েরা কুকুর মরলে দুঃখ প্রকাশ করে এমন কি তাদের তারবীর [illegible] চাকর মরলে অনেক সময় কাঁদে কিন্তু যদি কোন [illegible] চীনা একটু ঔদ্ধত্য দেখায় তবে তাদের পিপড়ের মত টিপে [illegible] [illegible] করে না। কিন্তু এটা তাদ দেশ। [illegible]

ধরণের ওস্তাদী চলে না। এখানে ইউরোপীয় বিচারক নাই, এখানকার জেলে সকলে সমান ব্যবহার পায়। ইউরোপীয় কয়েদীদের জন্য বিশেষ কোনরূপ ব্যবস্থা হয় না। অষ্ট্রেলিয়ান যুবক তা জানত তাই তার মাথা ঠিক ছিল। কিন্তু ঐ চীন ব্যাটা হল একের নম্বর গোলাম, সে তার সমশ্রেণীর লোকের কাছেই দাপট দেখাতে পারে, অপরের কাছে পোষা কুকুরের মত হয়ে থাকে।

আমি চীনাটাকেই বললাম "যাও নীচ থেকে বয়কে ডেকে নিয়ে এস, একটা রুম দেখিয়ে দেবে।'

লোকটা বিনা বাক্যব্যয়ে নীচে গেল এবং চীনা বয়কে ডেকে এনে একটি রুম খুলিয়ে ওকে সংগে করে প্রবেশ করল।

চীনাটা ঘরে ঢুকে অষ্ট্রেলিয়ান লোকটার কাছে সকল কথা নিশ্চয়ই বলেছিল। অষ্ট্রেলিয়ান তার কথা শুনে আমার প্রতি বেশ একটু রুষ্ট হয়েছিল এবং যখন বেরিয়ে এসে ফের আমারই কাছে বসল তখন তার সিংগাপুরী মেজাজ ফিরে এসেছে। তার ছিল সিংগাপুরী মেজাজ আর আমার ছিল স্বাধীন মেজাজ। উভয় মেজাজে বেশ জমে উঠেছিল। ওদের মেজাজ গরম হবার প্রথম কারণ হয়, যখনই এরা স্বাধীন শ্যাম দেশে আসে তখন তাদের হাতে এত বেশী টাকা থাকে যে, টাকার সাহায্যে অনেক সময় তারা অনেক কুকর্ম করতেও ছাড়ে না। এদেশী লোকেরা ওদের কুকর্মে টাকা নিয়ে সাহায্য করে বটে কিন্তু টাকা পাবার পরই আবার স্বমূর্তি ধারণ করে কুকর্মকারীকে ধরিয়েও দেয়। আমার ব্যবসা বাণিজ্য ছিল না। আমি ছিলাম একজন চাক্কুরে। তাও লোপ পেতে বসেছিল। অতএব আর্থিক দিক থেকে নবাগত অষ্ট্রেলিয়ানের দ্বারা আমার কোন ক্ষতি হবার সম্ভাবনা ছিল না।

আর একটি দিন মাত্র মাঝে আছে তারপরই আমি জাহাজে উঠব। ইচ্ছা ছিল একবার শ্যাম দেশটার ভেতরের এবং বাইরের সংবাদ কিছু নিয়ে নেই। শ্যাম দেশের অধিকাংশ লোকই শিক্ষিত সেজন্য অভ্যন্তরিক সংবাদ নিতে বেশীক্ষণ লাগল না! শিক্ষিতদের মধ্যে যাদের সংগে আমার সাক্ষাৎ হয়েছিল তাঁরা প্রায়ই সরকারী কাজ করেন। থাইল্যাণ্ডের প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেটের মাইনে হল পঁচাত্তর টিকেল অর্থাৎ আমাদের দেশের এক শত টাকা মাত্র। ম্যাজিষ্ট্রেটের কাজ নেওয়াটা সকলে পছন্দ করে না, কারণ ম্যাজিষ্ট্রেটের কাজের নির্ধারিত সময় নাই এবং কি কি কাজ করতে হবে তারও একটা ফিরিস্তি নাই। স্যানিটেসন হতে আরম্ভ করে শিক্ষা-বিভাগ পর্যন্ত দেখতে হয় এবং রীতিমত সকল বিষয়ে তদ্‌বির করতে হয়। ম্যাজিষ্ট্রেটের চরিত্রে দোষ হওয়া বড়ই মারাত্মক কথা। সরকারী-বিচারে জেল বাসের বদলে সর্বসাধারণের হাতে গোপনে নিহত হবার সম্ভাবনাই বেশী থাকে। এদেশেও আমেরিকান এবং জাপানী অনুকরণে সরকারী কর্মচারীদের শাস্তি দেবার একটি প্রতিষ্ঠান আছে। সেই প্রতিষ্ঠানটি কেমন জায়গা, তাই দেখাই ছিল আমার প্রধান উদ্দেশ্য।

এই প্রতিষ্ঠানটী জনসেবার জন্যই স্থাপিত হয়েছে। আইন অনেক সময় জনসেবায় বাধা দেয়, এমন কি জন-সেবার পক্ষে ক্ষতিকর হয়েও দাঁড়ায়। এমন অনেক ঘটনা ঘটেছে যাতে দেখা গেছে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যাংক হতে চুরী করে মাত্র দশ বৎসরের জন্য দোষী লোকটা কারাগারে গেল। সে সব লোক আবার জেল হতে ফিরে এসে তার চোরাই টাকার ব্যবসা-বাণিজ্য করে [illegible] বড় বড় স্থানই অধিকার করে, সমাজও তাকে মাথার উপর [illegible] [illegible]।

এরূপ লোক অনেক সময়ই খামখেয়ালী হয় এবং সমাজের পক্ষে খুব ক্ষতিকর হয়। সমাজ সেই ক্ষতি নীরবে সহ্য করে নেয় এবং তথাকথিত ভগবানকে সমাজ-ধ্বংসী লোকটার পাপের শাস্তি দেবার ভার দেয়। রাজপুরুষদের অত্যাচারও সমাজ সেরূপ ভাবেই অনেক সময় সহ্য করে। আমেরিকায় সেরূপ সমাজধ্বংসকারীর সংখ্যা এক সময় বেড়ে যায়। তাদের দমনার্থ হঠাৎ দেখা গেল এক শ্রেণীর তথাকথিত গুণ্ডার আবির্ভাব হয়েছে। তাদের কাজই ছিল অত্যাচারী রাজপুরুষদের, লোভীদের এবং সমাজধ্বংসীদের গুলি করে হত্যা করা। তার ফল কিন্তু বেশ ভাল হয়েছিল। যে সকল সেনেটর কংগ্রেসে বসে নিজের মতলব সিদ্ধি করবার জন্য নূতন নূতন আইন তৈরী করছিলেন তাঁদের মধ্যে অনেকেই অক্কা পেলেন এবং তাঁদের স্থলে নতুন যাঁরা এলেন অনেক সময়ই এসব কুকর্ম হতে প্রাণের ভয়ে নিবৃত্ত থাকতেন এবং অনেক সময় তাঁদের সমব্যবসায়ীদের হত্যাকারীকে টেররিষ্ট নাম দিয়ে সমাজে অপদস্থ করবার চেষ্টা করতেন। এই ধরণের জনসেবাকারী সংঘ এসিয়াতে সর্বপ্রথম জাপানে গড়ে উঠে এবং তারা ব্লেক-ড্রাগন নামে পরিচিত হয়। সেই অনুকরণেই থাইল্যাণ্ডেও একটা দল গড়ে উঠেছিল, তাদের কাজই ছিল যারা অন্যায় ক'রে অর্থ অর্জন করে এবং সেই অর্থের সাহায্যে নানারূপ খারাপ কাজ করে, তাদের গুলি ক'রে হত্যা করা।

এই কারণেই শ্যামদেশের উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী ভদ্রলোকের দিকে বেশী মন দিতেন না অথবা বেশী সম্মানের জন্যও দাবি করতে পারতেন না, কারণ তাঁরা সকল সময়েই বিশেষ ভাবে অবগত ছিলেন যে, তাঁদের জীবন পদ্ম-পত্রের জল বই আর কিছু নয়। তাঁদের কাছে যে-[illegible] লোক যে কোন ভাবে গিয়ে কথা বলতে পারে। [illegible]

তাঁদের পক্ষে একজন সাধারণ লোকই ছিলাম, কিন্তু সাধারণ লোকের জন্যই আইন এবং ম্যাজিষ্ট্রেট। ম্যাজিষ্ট্রেট মহাশয়কে আমি জানিয়ে ছিলাম, কয়েক মাসের জন্য হয়ত মালয় দেশেই থাকব। এ কথার উত্তরেও ম্যাজিষ্ট্রেট বলেছিলেন "আমাদের জীবন পদ্ম-পত্রের জল একথাটা নিশ্চয়ই জানেন; অতএব বিদায়ী নমস্কার।" ম্যাজিষ্ট্রেটের "বিদায়ী নমস্কার" আমার কাছে বেশ লেগেছিল। বিদায়ী নমস্কারের সংগে আ-হংএর সংগে অনেক সম্বন্ধ ছিল। আ-হংও এক জন সমাজ সেবক। আ-হং শ্রেণীর লোকের সন্ধান এসিয়ার লোক তখনকার দিনে কমই জানত। তখনকার দিনে পৃথিবীর পাপীর দল এসিয়াবাসীকে নানারূপ শ্লোগানের ভেতরে ডুবিয়ে রেখেছিল।

একই সূর্যের নানা রকম রূপ। শ্যাম দেশের সূর্য উজ্জল, প্রখর এবং আরামদায়ক। শরীর যদি সুস্থ থাকে তবে সবই ভাল লাগে। এখানে আমার শরীর সুস্থ এবং সবল ছিল। সেজন্যই আমার চোখে যা দেখেছিলাম তাই দেখতে ভাল লেগেছিল। ভংকা শহর আমার কাছে তখন আরামপ্রদ বলে মনে হচ্ছিল এবং শহরটা পরিত্যাগ করবার ইচ্ছা মোটেই ছিল না। কিন্তু কর্ত্তব্য করে যেতে হবেই। বেলা দশটার সময় জাহাজঘাটে গেলাম। কুলিরাও জাহাজঘাটে উপস্থিত ছিল, আমার কুলি বলে আটজন লোককে পরিচয় করে দিলাম। তারা মোটর বোটে উঠল তারপর আমি তাদের বাক্স বিছানা অন্য মোটর বোটে উঠিয়ে দিয়ে তাতে চেপে বসলাম। বিদায়ের বেলা কাষ্টম অফিসারদের নমস্কার করলাম, তারাও প্রতিনমস্কার করলেন। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস হঠাৎ বেরিয়ে পড়ল মনে হল যেন কিছু হারিয়েছি। যে দেশে এতদিন আমার কাটল তাকে বুঝি বা গোপনে ভালো বেসে-ছিলাম। ভালো লেগেছিলাম এই নির্জন নিস্তব্ধ শান্ত জীবনের গভীর

প্রশান্তিকে, ভালো বেসেছিলাম এখানকার অধিবাসীদের জীবনযাত্রাকে, শ্যাম দেশকে ভালোবেসেছিলাম।

এবার যাত্রা আমার অকূলে—সঙ্গে আমার কয়েকটি অপরাধী, আমি একলা। এদের সংগে আমার আত্মার যোগ নেই, এদের সংগে আমার কতটুকুই বা পরিচয়। এরা কেমন মানুষ তাও জানি না, শুধু বিশ্বাস করি এদের নইলে এই প্রবল সমুদ্রের অথৈজলে কয়েকজন অজানা মানুষকে আমার ভাগ্যের বিধাতা করে পাড়ি দিতে ভরসা পেতাম না। একলা এদের আমি বিশ্বাস করি সন্দেহও করি। আ-হং আমাকে তিন শত শ্যাম দেশের টাকা দিয়েছিল। সর্ত ছিল আমার নিয়োজিত কুলি বলে পরিচয় দিয়ে তাকে এবং তার সংগের আরও সাতজন লোককে পিনাং পর্য্যন্ত পৌঁছে দিতে হবে। চীনা কুলি কখনও কাউকে সেরূপ টাকা দেয় না, এরা শ্যামদেশ হতে এমন কিছু চুরি করে আনতে পারেনি যা বিক্রি করে প্রচুর টাকার মালিক হতে পারে। যদি সেরূপ কিছু নিয়ে আসত তবে নিশ্চয়ই কাষ্টম হাউসে ধরাও পড়ত।

যাকগে—এরা এখন আমার কাছে কিছুই বলবে না। পিনাং পৌঁছে হয়ত কিছু বলতে পারে, সিংগাপুর গিয়ে হয়ত সকল কথাই প্রকাশ করবে। পিনাং অথবা সিংগাপুর পৌঁছান পর্য্যন্ত ধৈর্য ধরে থাকাই ভাল। আমি যে এদের নিযুক্ত করেছি তাও বিশেষ করে হাবভাবে প্রকাশ করা চাই। দ্বিতীয় শ্রেণীর কেবিনে বসে থাকা চলবে না। তাই নীচে গিয়ে কুলিরা কেমন ভাবে আছে দেখলাম। যে সকল বৃটিশ জাহাজ আমার সমুদ্রে [illegible]

তার গঠন অন্য ধরণের হয়; কারণ এশিয়ায় লোক সুখ কাকে বলে এখনও শেখেনি। আরব, হিন্দু, মালয় এবং বর্মীরা হিন্দুর কাছ থেকে একেবারে হিন্দুই হয়ে গেছে। এই চারটি জাতই সর্গে গিয়ে আনন্দ করতে চায়, আর এই পৃথিবীতে কুকুর বিড়ালের মত থাকতে চায়। চীনারা নিজেদের দেবতা বলে পরিচয় দেয় এবং নিজের দেশকে সর্গই বলে অতএব তাদের পক্ষে সুখ-সুবিধা ভোগ করা এই পৃথিবীতেই। যদিও চীনা যাত্রী তৃতীয় শ্রেণীতেই বসেছিল তবুও তাদের কাছে খাবারের কিছু না থাকায় তাদের বসবার স্থান পরিষ্কার ছিল। চীনারা খাবে কোম্পানীর দেওয়া খাদ্য। কোম্পানীর দেওয়া খাদ্যে গরু এবং শূকর মাংস ব্যবহার হয় সেজন্য হিন্দু এবং আরবগণ সেদিকে ঘেঁসে না। হয় তারা রুটী এবং ফল মূল খায়, নতুবা উপবাস করে। আমার হিন্দুত্ব চলে গিয়েছিল বহু পূর্বেই। বাংগালী মুসলমান বিদেশে গিয়েও তাদের কুসংস্কার পরিত্যাগ করতে পারে না, কিন্তু বাংগালী হিন্দুর ছেলে বিদেশে সুখেই দিন কাটায়। আমিও জাহাজে নানারূপ খানা খেতে লাগলাম। মাঝে মাঝে বাইরে গিয়ে চীনা কুলীরা কি খাচ্ছে, কেমন আছে দেখে আসতে লাগলাম। আমার সময় বেশ আনন্দে কাটতে লাগল, মনে মনে ভাবতে লাগলাম আমি যে কোন কঠিন কাজ হাসিমুখেই গ্রহণ করতে পারব। আমার মনে বেশ একটা গর্বের ভাব এসেছিল।

তৃতীয় দিন সকাল বেলা জাহাজ পিনাং বন্দরে নঙ্গর করল। কোয়েরেন্টাইন যেতে হল না। সাম্পান-যোগে তীরে নামলাম। আ-হুং-এর ইংগিতে তৎক্ষণাৎ কাউম হাউসের বাইরে গিয়ে রিকসায় বসলাম। সাতজন কুলি ভিন্ন ভিন্ন পথ ধরল শুধু আমি আর আ-হুং একটি চাইনিজ হাউসে একই কামরায় গিয়ে উঠলাম। [illegible] গিয়ে [illegible]

পাঁচটি ডলার হাতে দিয়ে বলল, কেরাণী আমার বাক্সটা এখন তোমার কাছেই থাকল। রুমের ভাড়া সাত দিনের জন্ত দিয়ে দেব। তুমি এখানে সাত দিন থাকবে, তারপর আমার তোমাকে নিয়ে সিংগাপুর যাব। যদি দরকার হয় তবে ইপো এবং টাইপিং-এ নামব। তখন তোমাকে আবার কুলি খুঁজতে হবে। এখন থেকে তোমাকে আমি রীতিমত মাসিক বেতন দেব। বলত কত হ'লে তোমার খরচ চলে যাবে?

কোনরূপ চিন্তা না করেই বললাম, ষাট ডলার-এর কমে হবে না।

আ-হং তাতেই রাজ হ'ল এবং চীনা প্রথাতে নমস্কার জানিয়ে আমাকে ঘরের ভিতরে রেখে বা'র হতে দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে চলে গেল।

এ আমার পক্ষে বিড়ম্বনা, কর্ম্মহীন অলস অবসর খুব বেশী ভালো লাগে না। কাজের পরই আলস্য করা চলে, শুধু আলস্যের অনবসর মানুষকে কর্ম্মের দিকেই আকর্ষণ করে। শরীর যদি সুস্থ থাকে তবে কাজ করতেই হয়। ঘরে বসে ভাবছিলাম এখন কি কাজ করব? বই-পড়া আমার কাছে মোটেই ভাল লাগে না। মনকে বললাম, চল একবার পিনাং-এর বাংগালীরা কেমন আছে তাই দেখে আসি।

সিলেটি মুসলমান পিনাং-এ অনেক ছিল তাদের সংগে আমার পরিচয় ছিল না। আমার দেশের স্থানে এক জিলারও অনেক মুসলমান ছিল তারা কোথায় থাকে তাও আমি জানতাম না। কাজ আমাকে কিছু করতে হবেই, তাই ঠিক করলাম নোয়াখালী জেলার মুসলমানরা কে কোথায় থাকে তাদের খুঁজে বের করতে হবে তাদের সংগে পরিচয় করতে হবে, তারপর যদি দরকার হয় তবে তাদের সংগে থাকবার বন্দোবস্ত করতে হবে।

আমি যখন চিন্তা-ভাবনায় তন্ময় ছিলাম তখন কে এসে দরজায় আস্তে আঘাত করল। দরজা খুলে দিলাম। যিনি এসে আমার সামনে দাঁড়ালেন তিনি হলেন একজন চীনা গোয়েন্দা। আমাকে পেয়েই তিনি নানারূপ প্রশ্ন আরম্ভ করলেন। বুঝলাম যাদের আমি নিয়ে এসেছি তারা ভাল লোক নয়। ভাল হোক আর মন্দ হোক তাতে আমার কিছু আসে যায় না। গোপনীয় পুলিশকে জানিয়ে দিলাম, "অনেক দিন হল কোম্পানীর কাছে মাইনে পাইনি সেজন্য এখানে এসেছে এবং সত্বরই সিংগাপুর যাব। যে কয়টি চীনা আমার সংগে এসেছে তারাও কুলি। তাদেরও কাজ কর্ম নাই বলেই চলে এসেছে। ডিটেকটিভ আশ্চর্যান্বিত হয়ে বললে, "কুলি এসেছে?" আমি বললাম, "হাঁ মহাশয় কুলিই, ঐ দেখুন না সর্দার কুলির বাক্সটা আমার রুমেই আছে। গোয়েন্দা আমার আদেশ না নিয়েই আ-হং এর বাক্সটা খুলে ফেলল। তাতে ছিল কুলীদের দেনা-পাওনার হিসাবের খাতা। চিয়াং-কাইসেকের ফোটোযুক্ত চীনা ক্যালেণ্ডার মাজাং খেলার কাকৃন এবং অন্যান্য জিনিষ যা কুলিদের ব্যবহারেই লাগে। কাকৃনটা দেখে চীনা গোয়েন্দা বলল "দেখুন ত মশাই শ্যাম দেশের পুলিশের কাজ? কেব্‌ল্ করে জানিয়ে দিয়েছে আট জন ডাকাত আপনার সংগে এসেছে।"

আমি বিরক্তমুখে বললাম, "কিন্তু ঐ যে বাকৃসটা দেখছেন তাতে এমন কিছু নেই যা দেখে এদের ডাকাত বলে ধারণাও করা যায়।"

তিনি বললেন—"হুঁ আমারও তাই মনে হয়, আসল লোক নিশ্চয়ই পায়ে হেঁটে পিনাং আসবে। ডাকাত কথাটা বড়ই বিশ্রী।"

আমি গোয়েন্দাকে বললাম—"ডাকাত কি মশাই, এরাত সবাই কুলি এসেছে।"

আমার কথা শেষ হবার পূর্বেই একটা চীনা এসে বলল—"এই যে কেরাণী আমাদের বাকসটা নিয়ে যাচ্ছি। আজই আমরা টাইপিং যাব, অন্য কাজ পেয়ে গেছি। তোমার সংগে কথাই ছিল অন্যকাজ পেলে তোমাদের কাজ করব না।"

আমিও বেগতিক বুঝে তাকে বললাম—"যা ভাল বোঝ তাই কর।" ইংরাজীতে গোয়েন্দাকে বললাম "এরাই বোধ হয় কেবল বর্ণিত ডাকাত।"

আমার কথা শুনে গোয়েন্দা বাবলাব শ্যাম দেশের পুলিশকে গালা-গালি দিতে লাগল। লোকটা চলে গেলে গোয়েন্দা আমাকে বলল—আমরা কি মানুষ চিনিনা, আমরা মুখ দেখলেই বলতে পারি কে ডাকাত আর কে ভালমানুষ।"

গোয়েন্দা চলে গেল। আ-হং এর বাক্সটাও অন্য একটা লোক নিয়ে গেল। ডাকাত আমার সংগে এসেছে তারাও উধাও হল, এবার আমি একাকী। বাস্তবিকই কিসের একটা অভাব অনুভব করতে লাগলাম। ভাল করে স্নান করে, উত্তম একটি সুট পরে লজিং হাউস হতে বেরিয়ে পড়লাম। প্রথম গেলাম একটি খাবারের দোকানে। বেশ করে খেয়ে তারপর গেলাম পিনাংএর ঠাকুর বাড়িতে। এখানে একজন বাংগালী পূজারী কাজ করতেন। তাঁর সংগে সাক্ষাৎ হল। বেলা একটা পর্যন্ত ঠাকুরের সংগে গল্প করেই কাটালাম তারপর লজিং হাউসে এসে শুয়ে পড়লাম।

সাতদিন যে কোন প্রকারে আমাকে এখানে থাকতে হবে এবং আ-হং-এর সংগে দেখা করতে হবেই। আমার টাকা-পয়সারও অভাব নাই, অতএব এই সাতটা দিন কতকগুলি সংবাদপত্র কিনে তাই পাঠ করব ঠিক করলাম এবং বিকালের দিকে একটা পুরাতন পুস্তকের

দোকানে গিয়ে পুরাতন কতকগুলি পিনাং গেজেট, ষ্টেট টাইম্‌স্‌, মালয় ট্রিবিউন এবং অন্যান্য দু-একখানা লণ্ডনের সংবাদপত্র কিনে তাই পড়তে লাগলাম। মনে আছে—তার ভেতর ১৯২৭ সালের ডিসেম্বর মাসের লণ্ডন টাইমস-এ একটি বিশেষ প্রবন্ধ বের হয়েছিল তাতে লেখা ছিল—"যদি চীনা কমিউনিষ্টদের নিপাত না করা হয় তবে চীনা ন্যাসানাল গভর্ণমেণ্টও অকালে অক্কা পাবে। সুখের বিষয় চীয়াং কাইসেকই তার ব্যবস্থা করছেন।" এমনি ভাবে প্রবন্ধটি শেষ করা হয়েছিল, যাতে করে আমি বুঝতে পেরেছিলাম চীনা কমিউনিষ্টদের ওরা ডাকাত বলেই মনে করে। এদের কাজ-কর্মের কথা যত না বলা হয় ততই ভাল ইত্যাদি। মালয় দেশের সংবাদপত্রগুলিও সেইজন্য চীনা কমিউনিষ্টদেব ডাকাতই বলত। অনেকক্ষণ কাগজ পাঠ করে রোপ ইয়ক নামক একটি পথ দেখার ইচ্ছা হল। উদ্দেশ্য আর কিছুই ছিল না, যদি আ-হং-এর সংগে দেখা হয় তবে তার সংগে কথা বলে আরাম পাব।

রোপ-ইয়ক কদর্যস্থান। এখানে রাত্রে ভদ্রলোক চলাফেরা করে না। আমি একজন ভদ্রলোক সে ধারণা আমার সকল সময়ই ছিল। তবুও আজ এই মন্দ পথে পায়চারী করতে বের হতে হবে, তা কি ভাল হবে? মনের মাঝে তাই নিয়ে একটা গণ্ডগোল বাধল। অবশেষে রোপ-ইয়ক যাওয়াই স্থির করলাম এবং বিছানা হ'তে উঠে বসলাম। চুলিয়া ষ্ট্রীট হ'তে রোপ ইয়ক কাছেই। পোষাক পরে পথে বের হলাম। রোপ ইয়ক ষ্ট্রিটে গিয়ে একটি চায়ের দোকানে বসলাম পথচারী সকলেই চীনা, দোকানীও চীনা, শুধু আমিই একমাত্র বিদেশী চা-এর অর্ডার দিয়ে বসে, চায়ের দোকানের সাজ-সজ্জা দেখতে লাগলাম। বিজলি বাতি এত প্রখর ছিল যে চোখ ঝলসে যাচ্ছিল। চীনা এবং

জাপানীরা অতি উজ্জ্বল বিজলী বাতি ভালবাসে। আমেরিকানরাও সেরূপই। ইংরেজ অন্ধকার-প্রিয় এবং নীরবে থাকাটা যেন তাদের মজ্জাগত অভ্যাস। আমরা ইংরেজের প্রজা। ইংরেজদের আর কোন গুণ আমরা না পেলেও তাদের সেই নীরবতা এবং অল্প-আলো প্রিয়তা আমরা অভ্যাস করেছি। আমিও তা হতে বাদ পড়িনি। ভবিষ্যতে আরও কত গুণ আয়ত্ত করব তার অবধি নাই। নীরবে এবং অতি আলোর মধ্যেই চায়ের দোকানে সময় কাটাচ্ছিলাম। ভাবছিলাম আ-হং-এর দেখা পাব কিন্তু তার টিকিটিও দেখতে পেলাম না। অনেক-ক্ষণ বসলাম তারপর পথে এসে আরও জনাকীর্ণ পথের দিকে রওয়ানা হলাম। আ-হং-এর দেখা তবুও পেলাম না। আ-হং কোথায়? তাকে না হলে যেন আমার চলছিল না। রাত্র তিনটা পর্যন্ত পথে পথে বেড়ালাম, তবুও তার সংগে দেখা হল না।

আ-হং-এর সংগে একটি মাত্র বিষয়ে আমার সম্পর্ক ছিল। সেই সম্পর্কটি হল বিদায়ের বেলা বলে গেছে সে আমাকে ষাট ডলার করে মাসিক মাইনে দেবে। তার সংগে যদি আমার আর দেখা না হয় তবে সকল কথার শেষ মাসিক ষাট ডলার আর পাওয়া যাবে না। তখনকার দিনে টাকা অর্জনই ছিল আমার একমাত্র লক্ষ্য। তখন তন্ত্র-মন্ত্রে বিশ্বাস ছিল। মনে হল, মন্ত্রের সাহায্যে লোক গর্ত হতে সাপকেও উঠিয়ে আনে, আ-হং মানুষ, তাকে মন্ত্র-বলে কাছে নিয়ে আসতে পারবনা সে কেমন কথা? তাই সযত্নে রক্ষিত একটি মন্ত্রের বই খুলে একদিন গভীর রাত্রে মন্ত্র আওড়াতে লাগলাম। ভাবছিলাম তৎক্ষণাৎ দরজায় এসে আ-হং ধাক্কা দেবে, কিন্তু তা হল না। আ-হং-এর দেখা পাওয়া গেল না।

দুটো দিন সংবাদপত্র পাঠ করে এবং সিনেমা দেখে কাটিয়ে দিলাম। তৃতীয় দিনও কাটল। চতুর্থ দিন সকাল বেলা [illegible]

দরজায় মৃদুভাবে করাঘাত করল। ভাবলাম আ-হং এসেছে। দরজা খুলে দেবামাত্র একটি চীনা আমার সংগে ভাংগা মালয় ভাষায় এমনি ভাবে কথা বলতে লাগল যা শুনে কেউ ভাববে না সে কুলির কাজ ছাড়া অন্য কোন কাজ জানে। আ-হং-এর লোক বলে সে আমার কাছে তার পরিচয় দিল। তাকে আস্তে জিজ্ঞাসা করলাম কবে এখান থেকে রওয়ানা হতে হবে হে, আমার কাছে খাবারের আর টাকা নাই। লোকটা তৎক্ষণাৎ দশ ডলারের একখানা নোট বের করে দিয়ে বলল, আরও কয় দিন থাকতে হবে। বেশ করে খাও আর মজা কর। পিনাং হিলটা গিয়ে দেখে এস বেশ সুন্দর, সময় বেশ কাটবে। হ্যাপি ভ্যালিতে যেয়ো-বুঝলে কেরাণী, এখন আমি চললাম।”

তারপরই কাজের কথা আরম্ভ হল। বেশ উঁচু করে বললাম, “আমি সত্বরই টাইপিং এবং ইপো যাব, সেখানে যাবার পর যদি আমার কাজ হয় তবে তোমাদেরও কাজ হবে। কাজ কাজ করে আমায় ক্ষেপিও না; সিংগাপুরেও চিঠি লেখেছি, দেখা যাক কি হয়। তোমাদের ধৈর্য ধরে থাকতেই হবে, এখন যাও।”

চীনা লোকটাকে আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করলাম না। তবে আ-হং কে এবং কেনই বা সে এমন ভিগ্‌বাজী খাচ্ছে সে রহস্যটা ভেদ করার জন্য মনটা একটু উদ্‌গ্রীব হল।

সেদিন বিকালে হ্যাপি ভ্যালি দেখতে গেলাম। সুন্দর সে স্থান। নানা দেশের নর্তকীরা নাচ্‌ছে, গাইছে, আমোদ করছে। নানা রকমের লোক। কেউ কেউ জুয়াখেলার দোকান খুলে বসেছে। অনেকে যথাসর্বস্ব হারিয়ে মাথায় হাত দিয়ে বসে আছে, আবার কেউবা অনেক টাকা পেয়ে নানারূপ আমোদে মন দিয়েছে। হ্যাপি ভ্যালীতে নানাজাতীয় লোক একত্রিত হয়েছে। এত আনন্দ, এত

সৌন্দর্য কিন্তু আমি যেন কোথাও শান্তির সন্ধান পেলাম না। সবই যেন আমার চোখে ছায়াবাজীর মত আসছিল আর চলে যাচ্ছিল। পিনাং হিলেও ঠিক সেইরূপ হয়েছিল। মাথার কাছে কালো, সাদা, নীল, গাঢ় নীল, সবুজ রংগের মেঘগুলি দৌড়ে এসে আমাকে ভেদ করে তারা চলে যেতে লাগল। আকাশ কখনও মেঘে ঢেকে ফেলছিল আবার কখন বা মেঘ সরে যাওয়ায় সূর্যের তেজরাজি হঠাৎ পর্বতমালার উপর ছুটে আসছিল। নীরব চীনা মন্দিরের চীনা পূজারী নীরবেই এক ঘর থেকে অন্য ঘরে যাওয়া-আসা করছিল। তাদের খাবার ঘরে সামান্য ভাত আর সব্জি সিদ্ধ দেখে মনে হচ্ছিল ওরা এই খেয়ে কি করে বাঁচে। তাদের চোখের জ্যোতি আমার হৃদয়ে যেন ধারালো সূচের মত এসে প্রবেশ করে ফের বিপরীত দিকে বের হয়ে যাচ্ছিল। এটা মন্ত্র শক্তি নয় এটা অনেক দিন কৃচ্ছ্র সাধনের ফল। আমার কাছে পর্বতের নীরবতা মোটেই ভাল লাগছিল না। আমি মানুষ। আমি মানুষের সংগে থাকতে চাই। যাই হোক—পঞ্চাশ সেণ্ট দাও দিয়ে ফের ফিরতি গাড়ীতে বসে ফিরে এসে ট্রাম ধরলাম। ট্রাম নারিকেল ও সুপারী-বাগানের ভেতর দিয়ে শহরে আসচে। শহর দেখেই সুখী হলাম। মনের পরিবর্তন হল। আবার আমার স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে এল।

নবম দিনে সকাল বেলা পিনাং হতে রওয়ানা হবার আদেশ পেলাম এবং পথ-খরচা বাবদ আরও কুড়ি ডলার একজন লোক আমার কাছে দিয়ে গেল। আ-হং নিজে কিন্তু পিনাংএও আমার সংগে আর দেখা করল না। তার কথা-মতই আমি টাইপিং নামক স্থানে [illegible] থাকলাম। কেউ এসে [illegible] করল না, [illegible] হবে

তাও বলে দিল না। আমিও কারও আদেশের অপেক্ষা না করে সিংগাপুরের গাড়ীতে গিয়ে বসলাম এবং পরের দিন সকালবেলা সিংগাপুরের টেংক্ রোড নামক ষ্টেশনে গিয়ে নামলাম। কাছেই লংকা হোটেল নামে আমার পরিচিত একটি হোটেল ছিল, তাতেই গিয়ে উঠলাম। হোটেলের মালিক কয়েক দিন আমাকে বেশ করে খাওয়ালে, এতেও আমার মানসিক অবস্থার উন্নতি হ'ল না।

বোধ হয় দু'সপ্তাহ কেটে গেছে। এরই মধ্যে আমি আমার কোম্পানীর বিরুদ্ধে পাওনা বাকি বেতনের জন্য লেবার অফিসে নালিশ করে এসেছিলাম। পাঁচ শত ডলার পাব বলে সামান্য ইংগিত লেবার-প্রটেক্সন-অফিসার আমাকে দিয়েছিলেন। এরই মাঝে এক দিন আ-হুংএর সঙ্গে সাক্ষাৎ হল। আ-হুং আমার কাজের জন্য আমাকে ধন্যবাদ দিল এবং যদি ইচ্ছা করি তবে তাদের সংগে থাকতে এবং খেতে বলল। আমি সংগে থাকতে এবং খেতে রাজি হলাম না, তবে তাদের সংস্পর্শে থাকতে রাজি হলাম।

কে আ-হুং?

একটি লম্বা চিম্‌ড়ে শুক্‌নো প্রাপ্তবয়স্ক ভদ্রলোক হলেন আ-হুং। তিনি একজন নাম-করা শিক্ষিত লোক। তাঁর কাজই ছিল দেশ বিদেশে চীনাদের মাঝে প্রগতিশীল চিন্তাধারা বিস্তার করে। আমরা যেমন নির্জীব, চীনারাও ছিল ঠিক সেরূপই। শুধু আফিং-এর নেশায় তারা তন্দ্রা যেত না, আমাদের মতই ঘুমের ঘোরে তারা নানরূপ [illegible]ও আবদ্ধ ছিল। তবে চীনাদের সংগে আমাদের

একটি বিশেষ পার্থক্য আছে। চীনাদের মাঝে জাতিভেদ ছিল না এবং এখনও নাই। সেই মারাত্মক রোগ চীনাদের মাঝে না থাকার জন্যই তাদের জাতীয় পুনরুজ্জীবন তাড়াতাড়ি হচ্ছিল। চীন সরকারের আদেশে নয়, শুধু চীনা যুবকদের উপদেশেই মালয় এবং শ্যামদেশে যত চীনা ছিল তারা বারবণিতা-প্রথা একমাসের মধ্যে উঠিয়ে দিতে সক্ষম হয়। মালয় দেশের বৃটিশ সরকার এবং শ্যাম দেশের গণতান্ত্রিক সরকার ভেবেছিলেন বারবণিতা প্রথা লোপ হ'লে চীনারা উচ্ছৃংখল হবে, অপরের গৃহে প্রবেশ করে অন্যায় কাজ করবে, কিন্তু এসব ঘটল না। চীনারা আরও সাবধান হয়ে দিন কাটাতে লাগল। এতে মালয় এবং শ্যাম সরকারের আয় কমে যায়। এ কারণেই বোধহয় মালয় এবং শ্যামদেশ হতে প্রগতিশীল চীনাদের তাড়াবার বন্দোবস্ত হয়েছিল। আ-হং অশিক্ষিত চীনাদের মাঝে গোপনে শিক্ষা প্রচার করতেন। এক দেশ হতে অন্য দেশে নাম বদলিয়ে ভ্রমণ করতেন। আ-হং শ্যাম দেশেও চীনাদের ভেতর যাতে সত্বর মেনডেরিণ ভাষা প্রচলন হয়, এবং তারা তাড়াতাড়ি আফিম ছাড়তে পারে তারই জন্য চেষ্টা করছিলেন। বার বনিতাবৃত্তি উঠে যাওয়ায় শ্যাম-সরকারের সমূহ ক্ষতি হয়। এখন যদি আফিম-এর প্রচলনও বন্ধ হয়ে যায় তবে বিশেষ ক্ষতি হবার সম্ভাবনা ছিল, সেজন্যই আ-হং শ্রেণীর লোককে ধরে দেশে পাঠাবার বন্দোবস্ত হচ্ছিল।

একদিন দুপুর বেলা আমি আ-হংএর বাসস্থানে যাই। আ-হং আমাকে তাঁর ঠিকানা দিয়েছিলেন বলেই তাঁর কাছে পৌঁছতে সক্ষম হয়েছিলাম। তিনি যে ঠিকানায় আমাকে যেতে বলেছিলেন সেই ঠিকানা মতে বাসস্থানে পৌঁছে দেখি এটা একটা [illegible] মত বাড়ি

চীনা এখানে বাস করে। স্থানটাও সুবিধা নয়। চুরি ডাকাতি এদিকে প্রায়ই হয়ে থাকে। তারপর যে বাড়ীটার সামনে এসে দাঁড়ালাম সেটাকে দেখেই মনে হয় যে, বুঝি এখনই বাড়ীটা ধ্বসে পড়ল। এরকম বাড়িতে প্রবেশ করতেও আমার ইচ্ছা হচ্ছিল না। অতি কষ্টে দোতালায় উঠে সামনের ঘরের দোরে টোকা মারতেই দরজা খুলে গেল। হাসিমুখে আ-হং বেরিয়ে এসে আমাকে তার ঘরে নিয়ে বসালেন। ঘরের ভেতরটা বেশ পরিষ্কার ছিল। থু-থু ফেলা নিষেধ বলে দেওয়ালে নোটিশ লেখা ছিল। সিগারেট খেতে হলে অতি সাবধানে খেতে হবে এবং সিগারেটের ছাই যেন মেঝেতে না পড়ে সে দিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে একথাও বিজ্ঞাপনে লেখা ছিল। আমি সিগারেটও খেতাম না, থু-থু-ও মাটিতে ফেলতাম না, অতএব আমার পক্ষে তাঁর ঘরে বসাটা মোটেই কষ্টকর ছিল না।

আ-হং সেদিন তাঁব অতীত জীবনের ঘটনাবলী বললেন এবং তারপর চীনা জাতের কি করে উন্নতি করবেন তারই একটা পরিকল্পনা আমার সামনে ধরলেন। আমি তাঁর সে পরিকল্পনা দেখে ভাবতে লাগলাম চীনারা নিজের জাতের জন্য নিজের সুখ কত সহজে বিসর্জন দিচ্ছে! আ-হং একজন বিবাহিত লোক। তিনি কিয়াংসি প্রদেশের বাসিন্দা। অতি কষ্ট করে যে টাকাগুলি যৌবনে অর্জন করেছিলেন তাই পণ দিয়ে তাঁর স্ত্রী সাইচান্দকে বিয়ে করেছিলেন। সাই-চান্দ বিবাহের পর তাঁর ঘরকন্না সুচারু রূপেই চালিয়ে যেত। তবে তার একটা দোষ ছিল। সে মাথায় বেশী চুল রাখা পছন্দ করত না। ১৯২৬ সালে চীন দেশে নতুন করে আর একটা বিদ্রোহ হয়, সেই বিদ্রোহের সময় সাই-চান্দ সুযোগ পেয়ে মাথার চুল কেটে ফেলল এবং [illegible] "কাট" করে চুলগুলি গুছিয়ে রাখল। ১৯২৮ সালে

জেনারেল চিয়াং কাই-সেকের আদেশে দেশে যত "বব্ কাট"এর চুল ছাঁটা মেয়ে লোক পাওয়া গেল তাদের হত্যা করা হয়। সাই-চান্দকেও অবশ্য হত্যাই করা হয়েছিল। সাই-চান্দের একটি মেয়ে এখন কোথায় আছে আ হং তা জানেন না, কারণ সাই-চান্দকে হত্যা করার পর স্থানীয় পুলিশ তাকেও হত্যা করার আদেশ দেয়। আ-হং তাঁর আসল নাম পরিবর্ত্তন করে নকল নাম সা-হং নিয়ে বিদেশে রওয়ানা হন এবং প্রতিজ্ঞা করেন যে, যতদিন বেঁচে থাকবেন চীনাদের মাঝে তিনি ক্রমাগত বিদ্রোহভাব প্রচার করবেন এবং সুযোগ পেলে বিদ্রোহও করবেন। প্রচার কাজের জন্যই তিনি শ্যাম দেশে গিয়েছিলেন কিন্তু স্থানীয় চীনা নেসনেলিষ্ট দল তাঁর আগমন টের পায় এবং তাঁকে ধরিয়ে দিয়ে বেশ কিছু মোটা টাকা পুরস্কার পাবার চেষ্টা করে। তিনি কালবিলম্ব না করে ব্যাংকক হ'তে পালিয়ে পিণাং-এর দিকে রওয়ানা হন কিন্তু ভুল করে তংকায় এসে হাজির হন। এখানে তিনি তাঁর এক সমব্যবসায়ীর দেখা পান এবং আর্থিক সাহায্য পেয়ে পিণাং যাবার চেষ্টা করেন।

আ-হং স্ত্রী পুত্র হারিয়েছেন। স্ত্রী-পুত্র হারাবার পরও দেশের কাজে মন দেওয়া বিদেশীর শোভা পায়। আমি আ-হংএর কথা শুনে নিজের দিকে চেয়ে একটু লজ্জিত হলাম। প্রকৃত পক্ষে আমি দেশ সেবার কাজে কিছুই করছিলাম না। আমি অবিবাহিত। সংসারের বন্ধন নাই বললেও চলে। তবুও সংসারের চিন্তাই আমাকে সকল সময়ই কাবু করে রাখত। আমি আহং-এর স্বরে বলেই সা থেকে বাড়ির কথা সব ছুঁড়ে ফেলে দিলাম। এখন কথা হল আমি দেশ-সেবা করতে গিয়ে কি করব তাই ভাবছিলাম। এ [illegible]

উপদেশ চাইলাম। তিনি তৎক্ষণাৎ বললেন, "এ সম্বন্ধে আমাকে জিজ্ঞাসা না করাই ভাল কারণ আপনার দেশের অবস্থা আমি কিছুই জানি না।"

আ-হং-এর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সিংগাপুরে অনেক দেশবাসীর সংগে মিশতে লাগলাম। যতগুলি লোকের সংগে দেখা হ'ল তাদের মাঝে এমন একজনও লোক পেলাম না যারা দেশের কথা একটুও ভাবে। সকলেই স্ব-স্ব চাকরী বজায় রাখতে এবং যেন-তেন প্রকারে প্রমোশন পেতে, ও মাসের শেষে বাড়িতে কি করে টাকা পাঠাতে হবে তাই ভাবতেই আর সময় পায় না। আপনার গ্রহপথে তারা ঘুরপাক খায়, দেশ কি, দেশের কাজ কেন করা দরকার—এসব তাদের কাছে অবান্তর কথা। ফের আমি আ-হং-এরই শরণাপন্ন হলাম। তিনি দয়া করে কয়েকখানা বইএর নাম আমাকে বলেছিলেন, যা তখনকার দিনে সিংগাপুরে পাওয়া যেত না। এমন কি স্বদেশে যে সেই বইগুলি আমদানী [illegible] তাও আমার মনে হল না। কয়েক দিনের মধ্যেই কতকগুলি শিক্ষিত বাংগালী কুলির সংগে সাক্ষাৎ হয়। তাদের কাছ থেকেই আমি সর্বপ্রথম আমার দরকারী বইগুলি পাই এবং তাই তন্ময় হয়ে পড়তে থাকি। আমার এখানকার দিনগুলি বেশ আরামেই কাটছিল। অর্থাভাবও ছিল না এবং উপদেশ পাবারও লোকের অভাব হ'ত না।

মজুরী না পাবার জন্য কোম্পানীর বিরুদ্ধে মোকদ্দমা দায়ের করেছিলাম। মোকদ্দমায় সাড়ে তিন শত ডলার ডিগ্রি হয় এবং কয়েক দিনের মধ্যেই টাকা পেয়ে যাই। অনেকগুলি টাকা একত্রে পেয়েছি দেখে একজন বাংগালী আমার উপর ক্রমাগত দৃষ্টি রাখছিল। নতুন সাহিত্যে আমি [illegible] ডুবে থাকত। ভাব-প্রবণ [illegible]

করত। হাতের টাকা ট্রাংকেই পড়ে রইল। চোরের দৃষ্টি সেদিকে আকৃষ্ট হল। চোর ছিল শিক্ষিত। বই পড়ার সময় তাকে কাছে রাখতাম এবং বড় অভিধান খুঁজে শব্দার্থ বের করে শুনাতে বলতাম। সে অতি চতুর, আমার কথা তৎক্ষণাৎ পালন করত। মাসখানেক যাবার পর লোকটি কোথায় চলে গেল। আমি আমার টাকার কথা যেমন ভুলে গিয়েছিলাম তেমনি ভুলে গিয়েছিলাম সেই লোকটির কথা। একদিন সকাল বেলা হোটেলের ম্যানেজার এসে বিল দেয়। আমি তার বিল মিটিয়ে দেবার জন্য বাক্স খুলে দেখি তাতে একটি ডলারও নাই। তৎক্ষণাৎ বুঝতে পারলাম টাকা কোথায় গেছে। হোটেল-ম্যানেজারকে জানালাম বিকালে টাকা পাবে এবং বিকাল বেলা তার প্রাপ্য মিটিয়েও দিই। টাকাটা দিয়েছিলেন আমার একজন বন্ধু। বন্ধুকে যখন আমার টাকা চুরির কথা বললাম তখন তিনি আমাকে বেশ এক চোট নিয়েছিলেন এবং বলছিলেন আর হোটেলে থেকনা এখানে চলে এস, খাবার থাকবার এবং হাত খরচের অভাব হবে না। কিন্তু আমি সে দিনই চলে আসিনি, তখনও দুখানা বই পড়ার বাকী ছিল। মন দিয়ে তাই অধ্যয়ন করতে লাগলাম। হোটেলের ম্যানেজার কি করে বুঝতে পেরেছিল আমার হাতে একটি পয়সাও নাই এবং সেজন্যই সে প্রত্যেক দিন রাত নটার সময় বিল উপস্থিত করতে লাগল এবং যাতে আমি তার পাওনা প্রত্যহ দিয়ে দিই সেজন্য নানা কথা বলতে লাগল। প্রথম দিন যিনি আমাকে টাকা দিয়ে সাহায্য করেছিলেন তাঁর কাছে কয়েক দিন পর ফের টাকার জন্য যেতে হল। সেই ভদ্রলোক ভয়ানক রাগী। তিনি বললেন "এমন হোটেলে কেন থাকছে, নিজের মান-ইজ্জত বজায় রাখতে পার না? আচ্ছা, এখনই তোমার হোটেলে যাব এবং [illegible] বেশ দুকথা শুনিয়ে আসব।" [illegible]

বিশ্রাম করেই বের হবেন কিন্তু তা না করে হঠাৎ তাঁর মনে কি হল আর অমনি তিনি আমাকে নিয়ে হোটেলের দিকে রওয়ানা হলেন। পথে আমাদের মধ্যে কোন কথাই হল না। হোটেলে উপস্থিত হয়ে হোটেলের মালিককে ডেকে আমার থাকা এবং খাবারের তিন মাসের খরচ এক সংগে দিয়ে বললেন, আর যেন আমার বন্ধুকে তোমার ম্যানেজার কোনরূপ কষ্ট না দেয়। বন্ধু আমাকে হোটেলে রেখেই চলে গেলেন। আমি হোটেলে বসে বন্ধুর টাকা দেবার বাহাদুরীর কথা না ভেবে ভাবতে লাগলাম লোক কেন চুরি করে। মানুষকে মানুষ যখন অতিষ্ঠ করে তোলে তখনই মানুষ কুপথ অবলম্বন করতে বাধ্য হয়। যে লোকটা আমার টাকা চুরি করেছিল সেও নিশ্চয়ই আমার মত কোন বিপদে পড়েছিল। আমাকে বিপদ হতে উদ্ধার করার লোক মিলেছে, তার বিপদে সাহায্য করার কেউ ছিলনা বলেই সে এই কুকর্ম করতে বাধ্য হয়েছে।

ছমাস কেটে গেল। হঠাৎ মালয় ট্রিবিউনে দেখলাম আমার বিপদের বন্ধু চাকরি ছেড়ে দিয়ে পৃথিবী ভ্রমণে বের হবেন বলে ঠিক করেছেন। তাঁকে এই কাজে বাধা দিতে আমার সাহস হল না। তবে তাঁকে মৌখিক সাহায্যও করলাম না। তিনি চলে যাবার পর আমাকে সাহায্য করার মত লোক সিংগাপুরে ছিল না। প্রথম কয়েক মাস কম খেতে লাগলাম। তারপর অর্দ্ধ উপবাস, অর্দ্ধ উপবাসের পর নিরম্বু উপবাস করে দিন কাটাতে লাগলাম। শরীর ওতে শুকিয়ে গিয়েছিল। হঠাৎ একদিন মনে হল ঐ যে আমার বন্ধু তিনিও একদিন পদস্থ লোক ছিলেন, হয়ত তিনি দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে খাবার এবং থাকবার বন্দোবস্ত করছেন, আমিই বা কেন বসে থাকব। আমিও বিদেশে যাবার [illegible] বন্দোবস্ত

করব। বিদেশে যাবার পথ আমার মত লোকের পক্ষে খোলাই ছিল।

সিংগাপুরে বয়, বাবুর্চি, খালাসী আগুন-ওয়ালা এসব কাজে কোন বাংগালী হিন্দুকে নেওয়া হত না। বাংগালী মুসলমানের জন্য কিন্তু এসব কাজ খোলা ছিল। এই নিয়মটি প্রকাশ্যভাবে আইনে পরিণত হয় নি, তবে মৌখিক ভাবে এই নিয়মটি অক্ষরে অক্ষরে পরিণত হ'ত। কোন বাংগালী হিন্দুকে নাবিক হতে দেওয়া হ'ত না। বাংগালী হিন্দুর কাছে বিশেষ করে বিদেশে ধর্মটা কিছুই নয়। সেজন্য দরকার অনুযায়ী যে কোন বাংগালী, উড়িয়া এবং বেহারী তাদের নাম পরিবর্তন করে নাবিক হতেও সক্ষম হত। সারেং সাহেবরা ভাবতেন একবার মুসলমান হলে কি আর হিন্দু ধর্মে ফিরে যেতে পারবে? নিশ্চয়ই না। সময়ের পরিবর্তনের কথা তাঁরা মেনে নিতে রাজি হবেন না।

আমি একদিন একজন সারেং-এর কাছে গিয়ে স্ব-ইচ্ছায় ইসলাম ধর্ম কবুল করে আসলাম। আমার নতুন নাম হল, সুরত আলি। কথা হল সারেং আমাকে একটি বয়ের কাজ যোগাড় করে দেবেন এবং ইসলাম ধর্ম কবুল করার জন্য পঞ্চাশ টাকা নগদ দেবেন। আমি নগদ টাকাটা পেয়ে বেশ করে কয়েক দিন খানা-পিনা করলাম এবং ইতিমধ্যে যখন চাকরীর ঠিক হবে বলে শুনলাম তখন আমি মনের আনন্দে অলিতে গলিতে বেড়াতে লাগলাম। শরীরের শক্তি ফিরে এল। কাজ করবার প্রবৃত্তি জেগে উঠল। আমি যাব সাগরে, সাগরের ওঠা-নামার সংগে আমার শরীরও নাচবে। আমি তাতে আনন্দ পাব।

কাজ কাজই? তাতে ছোট বড় কিছুই নাই। একথাটা মনে রেখে যদি, কাজে অগ্রসর হওয়া যায় তবে, কিছুতেই বাধে না।

আমরা সেকথা অনেক সময় ভুলে যাই। আমাদের সমাজ নিন্দা এবং গঞ্জনা করে লোককে অসৎপথে পৌঁছে দিতে সক্ষম হয় কিন্তু কাজ দিতে পারে না। আমাদের ধর্মেও অন্ধ বিশ্বাস ক্রমেই চলে যাচ্ছে। সেজন্য আমাদের যে কোন কাজে অগ্রসর হওয়া দরকার হয়ে পড়েছে। হিন্দুদের মাঝে আজ এমন একটি লোক পাওয়া যাবেনা যিনি ধর্মান্তরকারীকে পঞ্চাশ টাকা নগদ দিতে পারেন। টাকা পয়সার দিকে অশ্বডিম্ব দেখিয়ে দিয়ে পরনিন্দা করার লোক হিন্দু সমাজে অভাব নাই। কিন্তু কতদিন লোক পরনিন্দাকে ভয় করবে? যারা পরনিন্দুক তারাই মুখ লুকিয়ে থাকবে। যারা কেরাণীর কাজ ক'রে বেশ ভাল আছে বলে মনে করে, তাদের অবস্থা যদি ভেবে দেখা যায় তবে দেখতে পাওয়া যাবে তারাও আধমরা হয়েই জীবন কাটায়। আমাদের সমাজের অবস্থা ভয়ানক দুর্বল। এ ক্ষেত্রে সমাজের উপর নির্ভর করব, সমাজের কটাক্ষ আড়চোখে দেখা কোনমতেই সংগত হবে না' ভেবেই আমি আনন্দের সহিত বয়ের কাজে যোগ দিয়েছিলাম।

মুসলমানী মতে আমার নাম বদলানো হয়ে গেছে। মুসলমানী বজায় রাখতে গিয়ে লুংগি এবং মাথায় টুপি পর্যন্ত ব্যবহার করতে হচ্ছে। সিপিং অফিস-এ আমার একটু আলাপ পরিচয় ছিল, পাছে করে তা লোপ পায় সেজন্য আমি সেদিকে যাওয়া-আসা বন্ধ করে দিয়েছি। আমার দিনগুলি সিংগাপুরের ছোট ছোট গলিতেই কাটছে। আমি যেন ক্রমেই ভুলে যেতে লাগলাম আমিই একদিন গৌরীশ— [illegible] চন্দ্র সিংহ রায় ছিলাম, মনে হতে লাগল [illegible]

অভিমান একটা মহা মারাত্মক বিষয়। আমার মত অনেক লোক গলিতে গলিতে অপরিচিত ভাবে জন্ম নিচ্ছে আর মরছেও। এদের কি আমার মত অহংকারী হওয়া উচিৎ? তারা অহংকার করতে পারে না কারণ তাদের অহংকার করার মত কিছুই নাই। আমি এই নিকৃষ্ট ছোটদের মাঝে আরও দু'মাস কাটিয়ে এক দিন সিপিং অফিসে গিয়ে নিজের ফটো উঠিয়ে সাগরে যাবার "পেপার" ঠিক করে নিলাম। সারেং ক্লান লাইনের একখানা জাহাজ যোগাড় করেছিল। ক্লান লাইনের জাহাজেব গমনাগমনের কোনও ঠিক থাকে না। যে দিক থেকে ডাক আসে সে দিকেই দৌড়ে যায়। সারেং যখন এই সংবাদটি আমাকে দিল তখন আমি বেশ সুখী হলাম, কারণ এবার আমাব জীবনের পরিবর্তন ভাল করেই হবে। কি রকম পরিবর্তন হবে তার একটু নমুনা দিচ্ছি। ছোট বেলা হতে ভাবতাম বিদেশীরা বিশেষ করে বৃটনরা বড়ই নিয়ম মেনে চলে। কিন্তু সমুদ্রতীরে এসেই দেখলাম, আমার সে ধারণা একদম বাজে। পরিবর্তনশীল জগতে রোজই কিছু না পরিবর্তন হচ্ছে। আমরাই শুধু স্থবির হয়ে দিন কাটাচ্ছি। বৃটনরা সময়ের পরিবর্তনে তালে তালে পা ফেলে ক্রমাগত নিজেদের আচারব্যবহার বদলাচ্ছে।

আজ আমি জাহাজে গিয়ে উঠব। আজ হতেই আমি যন্ত্রের কাজ করতে আরম্ভ করবো। যারা আমার মনিব হবে তারা চায় পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা। তাঁরা চায় চলতি নিয়ম কানুন। তারা চায় না মুসলমানদের প্রথায় লুংগি, দাড়ি, টুপি ইত্যাদি দিয়ে কাজ করা। তারা চায় চলতি নিয়ম; যা মানুষে চায়। আমিও কোট-পেন্ট এঁটে আড়াআড়ি নেকটাই লাগিয়ে জাহাজে উঠলাম। জাহাজে

অনেকগুলি অফিসার ছিল। তারা সকলেই ইংরেজ। প্রত্যেক অফিসারের এক একটি বয় থাকবে তারপর খানার টেবিলের বয়, স্নানাগারের বয় আরও অনেক রকমের বয়ও থাকবে। মোট অফিসার ছিলেন ছয় জন আর বযের সংখ্যা ছিল পনের জন। এরূপ বয়-বাহুল্য-যুক্ত কোন জাহাজ আজ পযন্ত কেউ দেখেনি। যে মুহূর্তে আমরা জাহাজে উঠলাম সেই সময় এক জন অফিসার এসে আমাদের দেখে নিলেন। আমাদের মাঝে দুজন পুরাতন বয় ছিল। জাহাজে উঠার দিন উভয়েই কাজের বাহুল্যে স্থির হতে পাচ্ছিল না। প্রথম অফিসার তাদের ডেকে নিয়ে সর্বপ্রথমে ক্ষৌরী হতে বললেন, তারপর তাঁরই তত্ত্বাবধানে ওদের স্নান করান হ'ল তারপর কাজে যাবাব আদেশ হ'ল। বুঝলাম এখানে সারেং-এর কোন আধিপত্য নাই। আরও কয়েকদিন পরে বুঝতে পেরেছিলাম—সারেং এবং তার সংগে যারা কাজ করে তাদেব ইংলিশ অফিসারগণ জীব-জন্তুর মত গণ্য করে। খালাসী এবং আগুনওয়ালাদের বৃজের উপর তাড়াতাড়ি কাজ করে চলে যেতে হয়। বয়দের শোবার যায়গাও উপরেই ছিল। প্রকৃত পক্ষে খালাসীদের সংগে আমাদের কোন সংশ্রবই ছিল না।

সিংগাপুর হতে জাহাজ ছাড়তে আরও দুদিন বাকি ছিল। এরই মধ্যে গোয়ানিজ বয়রা বিদায় নিয়েছে, আমরা ওদের স্থান নিয়েছি। একদল সিলেটি এবং চাটগাঁয়ের লোক বিদায় নিয়েছে অন্যদল তাঁদের স্থান নিয়েছে। বয়দের মাঝে যারা পুরাতন এবং সুপুরুষ তাদের কাজের ঠিক হয়েছে বাকি আটজন বয়ের কি কাজ করতে হবে তার এখনও কিছুই ঠিক হয় নি। আমিও তাদের একজন। বয়দের মাইনে খুবই কম। মাত্র একুশ টাকা, বুয়রা বাকেজ কাজ [illegible]

অফিসারদের মনস্তুষ্টি ক'রে বেশ মোটা টাকা অর্জন করত। আমি সে পথের পথিক ছিলাম না। আমি দেশ বিদেশ বেড়াব, ভাল খাবার খাব আর সমুদ্রের হাওয়া খেয়ে আমার শরীরের অবসাদ দূর করব এইটিই একমাত্র লক্ষ্য। হাত-খরচ বাবদ মাসে একুশ টাকা যদি পাওয়া যায় সে ভালই তবে।

আমাদের মাইনে কিন্তু একুশ টাকা ছিল না। আমাদের তিন মাসের মাইনে সারেংকে ঘুষ বাবদ দিতে হত। সি-ম্যান ইউনিয়নের চাঁদা দিতে হত। সিগাপুরের বাৎসরিক ঘর ভাড়া দিতে হত। এসব নানা হাবি জাবি দেবার পব হিসাব মতে মাত্র বাঁচত একশ টাকা। প্রতিবাদ করলে' সাবেং এসোসিয়েশনের কালো খাতায় নাম উঠবার কথা ছিল। যার নাম একবার সারেংদের কালো খাতায় উঠে তাদের জাহাজে চাকরী পাবার আর উপায় থকে না। সেজন্য এই অন্যায়কে সকলে মাথা পেতে নিত। আমি লণ্ডনে গিয়ে এ অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন চালাই এবং তারই ফলে বোধহয় নাবিকদের বর্তমানে কিছুটা সুবিধা হয়েছে।

আমি একজন "ফালতু" বয় ছিলাম। সেজন্য সহরে গিয়ে ঘুরে ফিরে আসবার সময়ও ছিল। বিকালের সংবাদ-পত্র খানা কিনে দেখলাম আমাদের জাহাজ সিংগাপুর হতে সোজা সিড্‌নী গিয়ে পানামাখা পেরিয়ে বোষ্টন হয়ে লিভারপুল পৌঁছুবে। মাঝে যদি কোনও পোর্ট হতে মাল নেবার জন্য আহ্বান পাওয়া যায় তবে তদনুযায়ী জাহাজের গতি পরিবর্তন করা হবে। মনে মনে ভাবলাম যদি [illegible] পাকে জাহাজ চলে তবে আমার কিছুই দেখা হবে না। দুনিয়ার "বাজার" দেখতেই পাব। যাকগে এখন আর চিন্তা করে কোনও লাভ নাই। 'সেই টাইম্‌স্' কাগজ খানা যত্ন করে বগল দাবা করে [illegible]'

জাহাজে আসলাম। ব্রিজ দিয়ে ওপরে ওঠার সময় একজন অফিসার আমাকে দেখেই বললেন—

তবে তুমি বেশ ভাল ইংলিশ জানো বলেই মনে হয় ?

হাঁ মশায়।

বয়ের কাজ নেবার কারণটা জানতে পারি কি ? অবশ্য সেজন্য চিন্তা করার কিছুই নাই।

অনেকদিন বেকার ছিলাম মশায়, বয়ের কাজ বেশ ভাল করেই জানি।

পূর্বেই বলেছি তোমার চিন্তা করার কিছুই নাই, এখন আমি মনে করব তুমিও একজন মজুর যেমন আমরা, এর বেশী নয়, তা হলে বোধ হয় ভালই হবে।

সেটা আপনাদের অনুগ্রহ মাত্র মশায়।

আমরা কোথায় যাচ্ছি বোধ হয় সংবাদপত্রে দেখেছ ?

হাঁ মশায় আগে সিডনী যাবে তারপর পানামা, তবে এর ত কোন ঠিকানা নাই কোথাও দরকার পড়লেই জাহাজের গতি পরিবর্তন হবে।

যতার্থই তাই এদিকে আস আজকের সংবাদটা একটু দেখে নিই।

আমি অফিসারের হাতে কাগজ খানা দিয়ে বললাম, সংবাদ পত্র পড়া হয়ে গেলে কেবিনে রেখে দেবেন, আমি গিয়ে নিয়ে আসব তাই বোধ হয় ভাল হবে, কেমন নয় কি ?

অবিকল তাই।

মনে হল লোকটার "অবিকল তাই" বলার একটা [illegible] আছে। কিন্তু সেরূপ মনে করাটা আমার পক্ষে অন্যায় [illegible]।

মিঃ মরিসন বনিয়াদি ঘরের ছেলে। তাদের চাল-চলন পৃথক। সে ওজন ক'রে কথা বলে এবং তার প্রত্যেকটি কাজ বনিয়াদী ঘরের লোকের মতই। এরূপ বনিয়াদী ঘরের ছেলে জাহাজী কাজে খুব কমই আসে। তবে লোকটার বনিয়াদী প্রবৃত্তি লোপ পেয়েছে। তার মন স্বাভাবিক অবস্থায় এসেছে। সংবাদ-পত্র খানা ফিরিয়ে আনতে ইচ্ছা করেই সেদিন তার কেবিনে গেলাম না। পরের দিন সকাল বেলা যখন সেই অফিসারের সংগে দেখা হ'ল তখন তার কথার ভাবে বুঝলাম লোকটি একেবারে আধুনিক ভাবাপন্ন।

সকাল পাঁচটার সময় আমাদের মালের জাহাজ সিংগাপুরের বন্দর ছেড়ে বাহির-দরিয়ায় (হাই-সি) এসে পড়ল। জাহাজ বেশ দুলতে লাগল। নব-নিযুক্ত বয়দের মাঝে অনেকেই সমুদ্র রোগে আক্রান্ত হ'ল। আমারও শরীরটা কেমন করে উঠল। কিন্তু আমার মনের জোরের প্রভাবে ঐ রোগটাকে বেশ ভাল ক'রেই ভুলে গিয়ে বয়ের কাজে মন দিতে পারছিলাম। কতকগুলি ছুরি চামচ এবং কাঁটা বালির সাহায্যে তক্তায় ঘষে পরিষ্কার করার কাজ আমাকে দেওয়া হয়েছিল। বসে কাজ করাটা মোটেই আমার পছন্দ হ'ত না তাই টেবিলের উপর যন্ত্রগুলি রেখে একটা চেয়ারে বসে কাজ করছিলাম। আমার পরিচিত অফিসারটি আমার কাজের পদ্ধতি দূর থেকে অনেকক্ষণ লক্ষ্য ক'রে শেষটায় কাছে এসে বলল—

তুমি কি কোন ভদ্র পরিবারের ছেলে?

আমার কাজ দেখে আপনার কি মনে হয়?

আমি মনে করি তুমি কোন ভদ্র পরিবারের লোক নিশ্চয়ই হবে।

তোমার ধারণা ঠিক হয়েছে।

আমার সম্বন্ধে তোমার কি ধারণা?

আমার মনে হয় তুমিও কোন আদব-কায়দা-জানা শিক্ষিত প্রাচীন পরিবার হতে এসেছ।

তোমার ধারণা "অবিকল ঠিক" হয়েছে। তবে একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে চাই, বোধ হয় তাতে তুমি রাগ করবে না, আমি বুঝতে পারিনি তুমি,কি করে এই উত্তাল সাগরে নীরবে কাজ করতে পারছ। তোমার কাগজ আমি দেখেছি তাতে বুঝলাম তুমি ধর্মে মুসলমান, সত্যি কি তুমি বাংগালী মুসলমান ?

না মশায়।

তুমি ছদ্ম নাম নিয়ে জাহাজের কাজে এসেছ বলেই মনে হয়!

অবিকল তাই।

নাম বদলাবার কারণটা জিজ্ঞাসা করতে পারি কি ?

কোনও ভদ্রঘরের ছেলেকে জাহাজের কাজে ভর্তি করা হয় না বলেই আমাদের ছদ্ম নাম গ্রহণ করতে হয়েছে।

অফিসার আর কোন কথাই বলল না। আমিও আমার কাজে মন দিলাম। সময় কাটতে লাগল। খানা-পিনা দেওয়া হ'তে আরম্ভ করে জুতা পরিষ্কার করা পর্যন্ত বেশ হাসিমুখে এবং সহজেই ক'রে যেতে লাগলাম। সমুদ্র রোগ আমাকে মোটেই কাবু করতে পারল না। রাত্রে বেশ ঘুম হল। পরের দিন সকাল বেলাও পুরাদমে কাজ চালিয়ে দুপুর বেলা একটু ফুরসৎ পেলাম। ইচ্ছা হ'ল দেখে আসি জাহাজ কত নট (সামুদ্রিক মাইল) চলে এসেছে। প্রথম ইন্‌জিনীয়ারের কেবিনে সেই চার্ট ছিল। দেখলাম আমাদের জাহাজ আন্দামানের দিকে অগ্রসর হচ্ছে এবং দিন রাত চলে মাত্র একশত ষাট মাইল এগিয়েছে। বাইরে এসে উপরের আকাশ এবং সমুদ্রের জলের দিকে তাকালাম। আমার মনে হ'ল এমন সুন্দর আর কিছু দেখিনি।

বড় বড় ঢেউ উঠছিল। ঢেউগুলি ভেংগে যাবার পূর্ব্বে তার উপর ছোট ঢেউ উঠছিল, সে ঢেউ হতে বাতাস জল উঠিয়ে আকাশে ছিটাচ্ছিল তারপর যখন সে জল নীচে পড়ছিল তখন তা দেখে মনে হচ্ছিল কি সুন্দর প্রাকৃতিক ফোয়ারা। সে ফোয়ারা নিমেষে জন্ম নিয়ে নিমিষে লয় পাচ্ছিল। উড়ুক্কু মাছগুলি দলে দলে জাহাজের আগে এবং পিছনে ছুটাছুটি করছিল। অনেক দূরে বড় বড় মাছ জাহাজের শব্দ শুনে কখন ভেসে উঠছিল আর কখন বা জাহাজের দিকেতে তাড়া করে আসছিল। জাহাজ আপন লক্ষ্যপথ হ'তে একটুও অন্য পথে না গিয়ে ঠিক পথেই চলছিল। মাছগুলি যেন জাহাজকে ভয় করেই গভীর জলে আত্মগোপন করছিল। কি চমৎকার সে দৃশ্য। অনেকক্ষণ বসে তাই দেখলাম তারপর উঠে আসলাম। কাজ আমাকে টেনে নিয়ে এল। আমার কাছেও একটা পকেট ঘাড় ছিল।

নবম দিন সকাল বেলা মস্ত বড় একটা পাহাড় আমাদের সামনে ভেসে উঠল। পাহাড়টা হঠাৎ ভেসে ওঠেনি। পাহাড়টা ছিলই তবে পৃথিবী গোল বলেই আমরা দূর হ'তে তা দেখতে পাচ্ছিলাম না। পাহাড়টা ক্রমেই বেশ পরিষ্কার দেখাতে লাগল। জাহাজ ক্রমেই পাহাড়ের কাছে যেতে লাগল। জাহাজ যখন পাহাড়ের কাছে গেল তখন একজন বয় আমাকে বলল এটা হল পোর্ট ব্লেয়ার। এখানেই আমাদের দেশ হতে লোক এসে দ্বীপান্তর বাস করে। এখানে নামবার কারো অধিকার নাই। আমরা কেউ এখানে নামতে পারব না, এমন কি জাহাজ জেটিতে ভিড়বেও না। কতকগুলি বড় বড় গাধা বোট এসে আমাদের জাহাজ হতে তাদের মাল উঠিয়ে নেবে। হলোও তাই [illegible]। কয়েকখানা গাধাবোটকে একটা ষ্টিম লনচ, টেনে আনে।

আমাদের কাছে রাখল। গাধা বোট হতে কতকগুলি কালো লোক নেমে এসে আমাদের জাহাজে উঠল তারপর সামান্য কয়েকটি ব্যাগ নিয়ে ফের গাদা বোটে গিয়ে নামল। লোকগুলিকে দেখে মনে হল তারা যেন নিগ্রো হবে। আমি এসব নিয়ে মাথা ঘামালাম না। নিজের কাজে ব্যস্ত থাকলাম। জাহাজ যখন আবার ছাড়বার সময় হল তখন ফের বাইরে ব্রিজের উপর দাঁড়িয়ে পোর্ট ব্লেয়ারকে ভাল করে দেখে নিলাম আর মনে মনে নানা কথা চিন্তা করতে লাগলাম।

কিসের সে চিন্তা? আমার কোন আত্মীয় কি এখানে এসেছে? না, কেউ আসেনি, তবে কেন চিন্তা? শুধু চিন্তা নয়, বেশ অনুতাপ, বেশ কষ্ট, বেশ মর্ম্মস্পর্শী অনুভূতি। জাহাজ যতই দূরে সরে যেতে লাগল ততই সমুদ্রের জল কালো হতে লাগল, ততই আমার সংগে আন্দামানের সংস্পর্শ যেন ছিঁড়ে যেতে লাগল। আমি তা ছিঁড়তে চাচ্ছিলাম না। আমি চাচ্ছিলাম আন্দামান আমার অন্তরের অন্দর-মহল হয়ে থাকে। এখানে আমার দেশের কত স্বদেশ-প্রেমিক পলে পলে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলছে আর তাদের শেষজীবনের শেষের দীর্ঘনিঃশ্বাস কবে চিরতরে বের হবে তারই কথা ভাবছে। আমরা দূরে থেকেই তাদের বাহবা দিয়েছি কিন্তু তাদের অন্তরের বেদনার একবিন্দুও কি অনুভব করতে পেরেছি? কিছুই না। ভাবপ্রবণতার উৎপত্তি যেমন পলকে হয় তার নিবৃত্তিও এক মিনিটেই শেষ হয়। আমাদের জাহাজ হঠাৎ মোড় ফেরাল। প্রপেলারটা কড় কড় করে উঠল। আন্দামান অদৃশ্য হল, আমরা নতুন পথের পথিক হলাম। আমি ভাবলাম। হয়ত জাহাজ এবার কলম্বো যাবে। কিন্তু কলম্বো এখান হতে অনেক দূরে। আন্দামান হতে কলম্বো যেতে হলে পথে আর কোন পোর্টই আসবে না। [illegible]

যে কয়লা নেওয়া হয়েছে তা অতি সামান্য। জলও ফুরিয়ে যাবে। আট নয় দিনের মধ্যে কোনও বন্দরে জাহাজ পৌছানো চাই-ই।

বয়ের কাজ আর কেরানীর কাজ একই কথা। অফিসারদের ঘর ঝাঁট দেবার সময় তাদের কাগজ পত্র গুছিয়ে রাখতে হয়, কিন্তু তাদের কাগজে কি লেখা আছে তা দেখতে নাই যদি কাগজপত্র দেখবার মন নিয়ে কাজ করা যায় তবে মনের পরিবর্ত্তন হয়, মুখ শুকিয়ে যায়, চোখের দৃষ্টিভংগি বদল হয়। আমি কখনও সেরূপ কাজ করতাম না বলেই আমার মুখের আকৃতি কখনও বদলি হত না। কিন্তু আমারই সমব্যবসায়ীরা অনর্থক কাগজপত্র ঘাটতে ভাল বাসত বলে প্রায়ই অপমানিত এবং নির্জ্জাতিত হ'ত। আমার সংগের বয়দের অপমানিত হতে দেখে দেখে একদিন আমারই কেবিনে একটা সভা করলাম এবং প্রত্যেক বয়কে বললাম "এরূপ অন্যায় কাজ যেন তারা আর না করে।" আমার উপদেশে কিছুই হল না। চিন্তা করতে লাগলাম বয়দের কিরূপে ছোট ছোট অন্যায় কাজ হ'তে বিরত করা যায় এবং কিরূপে তাদের মুখে হাসি ফুটানো যায়। নানা রকমের উপায় বের করতে সক্ষম হলাম বটে কিন্তু কাজে লাগবার মত কিছুই যোগাড় হল না।

অনেক দিন পর আবার সেই অফিসারটির সংগে সাক্ষাৎ হ'ল। তাঁর কেবিনে আমার দেওয়া সংবাদপত্রখানার কথা ভুলেই গিয়েছিলাম। দেখা হওয়া মাত্র অফিসার জিজ্ঞাসা করলেন—

সময় কেমন কাটছে?

"বেশ ভালই মহাশয়।

[illegible]দিকের সাগর একটু গাঢ় নীল তার কারণ জান?

জানি বই কি, সাগর যেখানেই বেশী গভীব হযেছে সেখানেই সাগরের জল গাঢ় নীল দেখাচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে জল নীল নয়, স্বচ্ছ।

আমরা কোন্ দিকে যাচ্ছি জানো কি?

না। জানতে ইচ্ছা হয় নিশ্চযই, তবে সে সুযোগ আমাদের নাই।

কেন চার্ট দেখলেই পার।

চার্ট থাকে প্রথম ইন্‌জিনিযানেব কেবিনে, তা আমি দেখেছি, তবে চার্ট দেখতে ইচ্ছা হয় না, কি জানি তাতে কোন গোপনীয় সংবাদও থাকতে পাবে।

আমদেব হ'ল মালের জাহাজ, আমাদের পথ গোপন রাখার কোন মানেই হয় না। তবে শুনে রেখো আমরা সুরাবায়া যাচ্ছি। সেখানে প্রচুর মাল ওঠাতে হবে। এখন আসি। সুরাত্রি।

অফিসার চলে গেল, আমিও আমার কাজে গেলাম। কয়েক দিনের মধ্যেই আমাদেব জাহাজ এঁকে বেঁকে বলিদ্বীপ ডাইনে রেখে সুরাবায়াতে এসে উপস্থিত হ'ল। মালবাহী জাহাজে বেশ একটা সুবিধা আছে। যেই জাহাজ কোন বন্দরে আসে অমনি অফিসারগণ বন্দরে চলে যায় এবং বন্দরের কয়েক দিনের জন্য একটানা ছুটি মিলে। আমিও সুরাবায়াতে পৌছে শহরে বেড়াতে গেলাম। তবে আমি যখনই পরিশ্রান্ত হতাম তখনই জাহাজে ফিরে এসে বিশ্রাম করতাম এবং গভীর রাত্রে কখনও শহরে থাকতাম না।

সুরাবায়া ছোট বন্দর। জাভাতে যাঁরা বেড়াতে আসেন তাঁরা সুরাবায়াতে সামান্য সময় থেকেই রেলগাড়িতে করে বৌদ্ধযুগের স্তূপ দেখতে যান। আমাদের পক্ষে দূরে যাওয়া দরকার ছিল না, সেজন্য কাছেরই দু-একটা স্তূপ দেখতে বেরিয়ে পড়লাম। সব খুঁটিনাটির কাজ করে বেশী আড়ম্বর করা সম্ভবপর নয়। শহরের কাছেই একটা ছোট

স্তূপ ছিল। একটি লোককে জিজ্ঞাসা করে পথ জেনে নিয়ে সেখানে গেলাম। স্তূপটি দেখেই মনে হল এটা একটা হিন্দু মন্দির, পরে হয়ত বৌদ্ধ স্তূপ হয়েছিল। বর্তমানে হয়েছে মসজিদ। মসজিদ করতে জাভানিজরা মন্দিরের পাথর খুলে পরিবর্তন অথবা পরিবর্দ্ধন করেনি। অন্যান্য দেশে কিন্তু তা হয়নি, পুরাতন কাঠামোটা হয় ভেংগে ফেলা হয়েছে নয়ত তাতে কাট ছাট করা হয়েছে। মালয় দেশে তার একটা ব্যতিক্রম দেখা যায়। মালয়রা শুধু কয়েকটা কবর খুদে তাতে কয়েক জন লোককে গোর দিয়ে তারই উপর কয়েকটি আরবী অক্ষর ছেড়ে দিয়েছে মাত্র। পরিবর্তন এইটুকুই।

সুরাবায়া শহরে মালয় ছাড়া ও মালয় বেশধারী কতকগুলি কালো লোক দেখতে পাওয়া যায়। তাদের সংগে কথা বলার চেষ্টা করে কোন উত্তর পাইনি। একজন গুজরাতীকে জিজ্ঞাসা করে জেনেছিলাম এরা নাকি আরব। গুজরাতীর কথায় আমার বিশ্বাস হয়নি। পরের দিন একজন মালয়কে কালো লোকগুলির পরিচয় জিজ্ঞাসা করি। মালয় লোকটি বলেছিল এরা হল সমুদ্রতীরবাসী আরব। এদের ভাষা আরবী। এরা কখনও মালয় অথবা জাভানিজ বলে পরিচয় দেয় না। এদেশে এরা লগ্নীর কারবার করে, সেজন্য এদের কেউ ভালবাসে না।

জাভা, সুমাত্রা, মালয়, বর্ণিও, সেলিবিস্ প্রভৃতি দ্বীপে যারা বাস করে তাদের আমি মালয় বলে ধরে নিলাম, কারণ এদের ভাষা হল মালয়। পর্যটকগণ কিন্তু তা বলে না। তারা বৃটিশ ডাচ এবং ফ্রেন্‌চদের অনুকরণে জাভানিজ, বালীনিজ ম্যালে ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করেন।

স্তূপ হতে ফেরার পথে একটি মালয় পাড়ায় গিয়ে মালয়রা কেমন করে বাস করে তাই জানতে ইচ্ছা হ'ল। এদিকে পা আর চলছিল না। সিংগাপুর, পিনাং প্রভৃতি স্থানে রিকসা পাওয়া যায়। এখানে

তা পাওয়া যায় না। চীনারা এখানে রিক্সা টানেনা। এখানে চীনারা কেন রিক্সা টানেনা তার সন্ধান নিতে প্রবৃত্তি হ'ল। অনেকগুলি চীনাকে সে কথাটা জিজ্ঞাসা করলাম কিন্তু কেউ আমার কথার জবাব দিল না। শেষটায় পথ চলে কাতর হয়ে এক জাপানীজ ডাক্তারের ডিস্‌পেনসারীতে গিয়ে বসতে বাধ্য হলাম। ডাক্তার বড়ই আমোদ প্রিয় লোক। তিনি ভেবেছিলেন আমি কোনও দুষ্ট রোগে আক্রান্ত হয়ে তাঁর শরণাপন্ন হয়েছি, কিন্তু যখন জানলেন পথ চলে কাতর হয়ে বিশ্রামার্থ তাঁর ঘরে আশ্রয় নিয়েছি তখন তিনি আমার সংগে বেশ ভদ্রভাবেই কথা বলতে লাগলেন। ডাক্তার সংবাদ প্রিয়। অনেকগুলি রোগী এল আর গেল, তিনি কিন্তু কারো দিকে তাকালেনও না। কম্‌পাউণ্ডারই সকল কাজ করল। ডাক্তার আমাকে পেয়ে সুখী হলেন এবং দুপুর বেলা আমাকে তাঁর বাড়ী নিয়ে গেলেন।

মানুষ পুরাতনকে বড়ই ভালবাসে। ডাক্তার বড়ই পুরাতন-প্রিয়। কোন্ যুগে ভারতের সংগে তাঁদের সম্বন্ধ ছিল তাই নিয়ে তিনি আলোচনা করতে লাগলেন। ডাক্তার তথাকথিত ধর্ম মোটেই মানেন না। তাঁর ঘরে আরবী ভাষায় লেখা একখানা কাগজও ছিল না। জাভানীজরা প্রায়ই তাদের ঘরের দরজায়, দেওয়ালে নানারূপ আরবী পদ্য ফ্রেম করে বাঁধিয়ে রাখে। ডাক্তারের ঘরে সেরূপ কিছুই ছিল না। ডাক্তার পুরাতনে ফিরে যেতে চান। তাঁর কেন এমন প্রবৃত্তি হল তাই আমি জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি চট্ করে বললেন, খৃষ্টান, বৌদ্ধ হিন্দু এদের মাঝে কুসংস্কার আছে বটে তবে কোনরূপ বন্ধন নাই। হিন্দু বলতে তিনি বলি দ্বীপের হিন্দুদেরই বুঝেছিলেন। বলি দ্বীপের হিন্দুরা বেশ স্বাধীন। তারা যা খেয়ে হজম করতে পারে তাই খায়। ধর্মের দিক থেকেও তাদের কোন বন্ধন নাই। তারা যার তার সংগে বিবাহ

সম্বন্ধ করতে পারে। তাদের মাঝে এখনও সিভিল বিবাহ প্রচলন আছে এমন কি 'ইকর' (ইকর-সংযোগ, একত্রে বাস) প্রথাও আছে। তাঁদের তা ছিল না, নিকে করতে হলেও একজন মুসলমান পাদ্রীর দরকার হয়। এসব ধর্মের বন্ধন তাঁর কাছে মহাকষ্টকর বলেই মনে হ'ত। তারপর ভাষার দিক দিয়েও তিনি এমন কতকগুলি ইংগিত করলেন যাতে করে বুঝলাম তিনি সংস্কৃত ভাষার যতটুকু পক্ষপাতী আরবী ভাষার দিকে সেরূপ সুদৃষ্টি তাঁর নাই। তাঁর কথা শুনে আমি কোনরূপ মন্তব্য করিনি কারণ আমি বেশ ভাল করেই জানতাম এসব কথার কোন মূল্যই নাই। তাঁর কথা শোনা হয়ে গেলে ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করলাম, "বলুন ত এখানে চীনারা রিকসা টানেন না কেন" ? ডাক্তার বললেন, এদেশে গরীব চীনা একদম আসতে পারে না, সেজন্যই এখানে রিকসার প্রচলন হয় নি। ডাচদের অধীনস্থ দেশে আসতে হ'লেই মোটা টাকা জমা রাখতে হয়। গরীব চীনারা সে টাকা দিতে সমর্থ হয় না। এদেশে গরীব চীনাদের প্রবেশ নিষেধ।

বিদেশ থেকে গরীব না হয় না আসল, কিন্তু এখানকার গরীবরা ত আর বিদেশে চলে যায় নি। এদেশে গরীবের সংখ্যা দিন দিনই বাড়ছে এবং তারই ফলে নানারূপ পাপ এসে দেখা দিয়েছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ ডাক্তার এমন কতকগুলি কথা বললেন যা বলতেও আমার প্রাণ কাঁপে। প্রকাশ্যভাবে স্বামীর বর্তমানে স্ত্রী অন্যের বাড়ীতে চাকরাণীর কাজ করে। এদেশে চাকরাণীকে নানা কাজ করতে হয়। গণিকাবৃত্তিও তার অন্তর্গত। একথাটা সকলেই জানে অথচ এরূপ অন্যায় কাজের প্রতিবাদ কেউ করে না। তারা ভাল করেই জানে এরূপ পাপের জন্য দায়ী হয় না এবং যে পর্যন্ত আর্থিক উন্নতি না হয় সে পর্যন্ত আইন করে কোন ফলই হবে না। ডাক্তার দুঃখ করে বললেন, "আমাদের এ

অবস্থার জন্য আমরাই দায়ী। আমাদের এখানকার লোকে ভাবে যদি দুঃখ কষ্ট করে একবার মক্কা যেতে পারে তবেই সকল পাপের অবসান হবে এবং মরলে পরে নিশ্চয়ই স্বর্গবাস হবে।" বলির লোক কিন্তু সেরূপ কিছুই ভাবে না। তারা ১৯০২ সাল হতে আরম্ভ করে ১৯১২ সাল পর্যন্ত ডাচদের সংগে যুদ্ধ করেছে। এতে তাদের অনেক ক্ষতি হয়েছে, অনেক লোক মরেছে, কিন্তু ডাচরা বুঝতে পেরেছে এদের দাবিয়ে রাখা তাদের পক্ষে সম্ভব হবে না। তাদেব মক্কা বলে তীর্থ স্থান নাই। স্বর্গে যাবার লোভও নাই। তারা তাদের দেশের প্রত্যেক বালুকণাকে স্বর্গ বলে মানে এবং সেই স্বর্গভূমিতে যাতে অন্য কেউ এসে হুকুম না করতে পারে সেজন্য তারা প্রাণ দেয়।

আমি ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করলাম তবে কি বলির লোক স্বাধীন?

নিশ্চয়ই তারা স্বাধীন। আভ্যন্তরিক ব্যাপারে ডাচরা মোটেই হাত দেয় না।

ডাক্তারের কথা শুনে আমার হাসি পেল। আভ্যন্তরিক ব্যাপারে ডাচরা বলি দ্বীপবাসীদের কাজ-কর্মে হাত দেয় না, বাইরের ব্যাপারে নিশ্চয়ই হাত দেয়। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলি দ্বীপবাসীরা পরাধীন। তবুও এত ছোট দ্বীপের অধিবাসী আজও মাথা উঁচু করে আছে জেনে সুখী হলাম।

আমাদের জাহাজ সুরাবায়াতে মাত্র বারোঘণ্টা ছিল। বার ঘণ্টার মধ্যে প্রায় তিন ঘণ্টা ডাক্তারের বাড়ীতে ছিলাম। ডাক্তারের বাড়ী থেকে বিদায় নিয়ে আরও কতক্ষণ পথে পথে বেড়িয়ে জাহাজে ফিরে এসে নিজের কাজে মন দিলাম। সকাল না হতেই জাহাজ কের নংগর উঠিয়ে হংকং-এর দিকে রওয়ানা হয়। অনেক দিনের একটা

প্রবল বাসনা ছিল হংকং এবং সাংহাই দেখব, এবার হয়ত তাই দেখার সুযোগ হবে ভেবে মনটা আপনি নেচে উঠল। শরীরে শক্তি এল। কাজে কর্মে উৎসাহ হল। খাওয়া দাওয়া এবং শরীরের ওজন বাড়তে চলল।

চীনসমুদ্র দুই ভাগে বিভক্ত—উত্তর এবং দক্ষিণ। চীনারা দক্ষিণ সমুদ্রের বড়ই প্রশংসা করে। প্রশংসা করাব অনেক কারণও আছে। পূর্বকালে চীনারা অপরের প্রতি বেশ অত্যাচার করত। সে অত্যাচারের মাত্রা এখন কমেছে। অত্যাচাব নাই বললেও চলে। অত্যাচার যদিও কমেছে তবুও চীনাবা এখনও বড় বড় নৌকা নিয়ে দক্ষিণ চীন সাগরে বেশ চলাফেরা করে। আমরা গংগা সাগরে যেতেই ভয় পাই। আমাদের জেলেরা সমুদ্রে গিয়ে মাছ ধরে না। চীনারা কিন্তু সেরূপ নয়, এখনও নৌকা—যাকে 'তংকাং' বলা হয়, তাই নিয়ে উত্তাল সমুদ্রতরংগে হাবুডুবু খেয়েও বেঁচে থাকে। সমুদ্রে জাহাজ ডোবার কথা শোনা যায় কিন্তু চীনা নৌকা কখনও ডোবে না। চীনা নৌকা গভীর সমুদ্রে কখনও বাতাসে উল্টা দিকে চালানো হয় না। যখন সমুদ্রে ঝড় ওঠে তখন পাল নামিয়ে দিয়ে হাল ধরে বসে থাকে। নৌকা বাতাসে যে দিকে যতটুকু ইচ্ছা নিয়ে যাক তাতে তারা একটুও ভয় করে না। এরূপ সাহস থাকায় [illegible] চীনারা বড় বড় নৌকার সাহায্যে প্রশান্ত মহাসাগরে পাড়ি দিয়ে উত্তর এবং দক্ষিণ আমেরিকায় আমেরিকানদের বহু পূর্বেই ক্যালিফরনিয়ায় পৌঁছাতে সক্ষম হয়। আগে পৌঁছলে কি হবে, চীনাদের মাঝে একতা চিল না অথবা সমাজ স্থাপন করে বাস করারও মতলব ছিল না, সেই জন্যই চীনারা আমেরিকানদের দ্বারা উৎপীড়িত ও অত্যাচারিত হয়ে ক্যালিফরণিয়া ছাড়তে [illegible]।

লোকে, বলে কালিফরণিয়ায় চীনাদের সাগর-জলে ডুবিয়ে মারা হয়েছিল। বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হয়েছিলাম চীন-জাপান যুদ্ধের পূর্বে চীনারা বৈকাল হ্রদের তীরে অবস্থিত চীতা নামক সহরেও বসবাস করত, কিন্তু মুষ্টিমেয় কসাক তাদের তাড়িয়ে দিতে সক্ষম হয়। যখনই কোন চীনা পরিবারকে কসাকরা লোপ ক'রে দিত তখন তারা বলত "আমরা সোনার খনি হতে ফিরে এসেছি।" এর মানে হ'ল চীনাদের পরিধেয় এবং তাদের সঞ্চিত টাকা পয়সা চীনাদের হত্যা করার পর সন্ধান করে বেশ পাওয়া যেত। যে জগতের লোক প্রথম বারুদ আবিষ্কার করেছিল তারাই কসাকদের হাতে কুকুর-বিড়ালের মত নিহত হয়েছিল। তাদের দূরদৃষ্টি না থাকার জন্যই তারা দ্বীপময় দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরে সর্বত্র বিচরণ করেও কারো কাছ থেকে কোনরূপ সহানুভূতি পেত না। চীনাদের বদনাম সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ছিল।

আমাদের জাহাজে একটিও চীনা ছিল না সেজন্যই জাহাজের ব্রিজ সর্বদা সকলের জন্য খোলা থাকত। যে সকল সওদাগরী জাহাজে চীনারা কাজ করে সেই জাহাজগুলির ব্রিজ সর্বদা বন্ধ থাকে এবং যাতে করে কোনও চীনা সেদিকে না যেতে পারে তারও উত্তম ব্যবস্থা থাকে। দক্ষিণ সাগরে পৌঁছার পর প্রায়ই চীনা জাংক তংকাং এবং ছোট ছোট সামপান্ দেখতে পেতাম। উত্তাল সমুদ্র-তরংগে তারা ভেসে চলেছে। তাদের চলার গতির নির্ণয় নাই। তারাও ব্যবসায়েই বের হয়েছে। তাদের একের অন্যে বিশ্বাস নাই। সুযোগ পেলেই এক নৌকা অন্য নৌকাকে আক্রমণ ক'রে যথা-সর্বস্ব কেড়ে নিয়ে মাঝিদের হত্যা করে। মাঝি-বিহীন [illegible] নৌকা অনেক সময় দক্ষিণ সমুদ্রে ভাসতে দেখা যায়।

এটাকে পশ্চিম দেশীয় লোক বর্বরতাই বলে। কিন্তু বিস্কে উপসাগরে সেরূপ দৃষ্টান্ত আজকাল অবশ্য দেখা যায় না, পূর্বে সেরূপ দৃষ্টান্তের অভাব ছিল না। চীনারা বিশৃংখল জলদস্যু আর বিস্কে সাগরের ষ্টিক বোটগুলি সুশৃংখল দস্যু এর বেশী কোন পার্থক্য নাই।

ক্রমাগত কয়েক দিন চীনাদের নৌকা দেখে দেখে আর তা দেখতে ভাল লাগত না। অবশেষে কখন গিয়ে হংকং পৌছাব তাই নিয়ে গবেষণা করতে লাগলাম। কিন্তু গবেষণা বেশীদিন করতে হল না। হঠাৎ একদিন দুপুর বেলা আমাদের জাহাজ মোড় ফিরলো। সামনেই একটা বড় পাহাড় দেখতে পাওয়া গেল। অনেকক্ষণ সেই পাহাড়ের দিকে চেয়ে থেকে লোক জনের অথবা লোকালয়ের অস্তিত্ব বুঝতে পারলাম না। ক্রমেই জাহাজ নিকটে আসতে লাগল। তবুও কিছুই দেখতে পেলাম না। পূর্বের দৃশ্যই পেলাম। দু'এক খানা সামপান্ যাওয়া-আসা করছিল। তারা কোথা থেকে আসছে আর কোথায় যাচ্ছে তা বুঝতে পারছিলাম না। কয়েক ঘণ্টার মাঝেই ফের জাহাজ মোড় ফেরাল। এবার লোকের বসতি, অন্যান্য জাহাজের আসা যাওয়া দেখতে পেলাম। ক্রমেই জাহাজ একটি ছোট প্রণালীর ভেতর দিকে প্রবেশ করতে লাগল। বাঁ-দিকে মস্ত একটা পাহাড়ের গায়ে ,হাজার হাজার লোকালয় দেখতে পাওয়া গেল। অনেকগুলি জাহাজ নংগর করে আছে তাও দেখতে পেলাম। আমাদের জাহাজও নংগর করল। নানা রকমের সামপান্ আমাদের জাহাজ ঘিরে দাঁড়াল। চীনা স্ত্রীলোক পরিচালিত সামপান্ দেখে আমি আশ্চর্য হলাম। মেয়েলোক নৌকা চালাতে পারে সে ধারণা আমার ছিল না। নানা রকম ভংগি করে, নানা রকমে ইংরেজী উচ্চারণ করে তারা আমাদের শহরের জন্য ডাকছিল।

কয়েক জন অফিসার তীরে যাবার জন্য সামপানে নামলেন। বয়, কুক এবং অন্যান্য নাবিক নামতে পারল না কারণ তাদের হাতে অনেক কাজ ছিল। আমিও কাজে ব্যস্ত ছিলাম।

সন্ধ্যার পূর্বেই অফিসারগণ শহরে চলে গেলেন। আমিও তীরে যাবার জন্য অতি যত্নে রক্ষিত সুটট পরিধান করে ডেকে এসে দাঁড়ালাম। আমার সামনে এক অপরূপ দৃশ্য ভেসে উঠল। সামনে মস্তবড় একটা পাহাড় আর তার সর্বত্র বিজলী বাতি ঝিলমিল করছে। পাহাড়টাকে অন্ধকার আকাশ বলেই মনে হচ্ছিল যেন অন্ধকার আকাশে অসংখ্য তারা ঝক মক করছিল। কল্পনা অনেক করলাম কিন্তু বাস্তব কাছে দাঁড়িয়ে ডাকছিল, আমার সামপানে এস, আমি তোমাকে যত্ন করেই তীরে নিয়ে যাব। যদি ইচ্ছা কর তবে তোমাকে তোমার ইচ্ছার মত স্থানও দেখিয়ে দেব। কোথায় আকাশ আর তারকা রাজি, আর কোথায় অন্নকষ্টে বিকট ভাবে নিজের শরীর বিক্রির ব্যবস্থা। কোন-রূপ দর-দস্তুর না করেই একটি সাম্পানে উঠলাম এবং তীরে গিয়ে একটি ভারতীয় টাকা সাম্পান পরিচালিকাকে দিলাম। পরিচালিকা নানা কথা বলতে যাচ্ছিল কিন্তু আমি সেদিকে কান না দিয়ে সামনের দিকে চেয়ে পথ চলতে লাগলাম। পথের পাশে শিখ এবং পাঠান পুলিশ চীনাদের দিকে চেয়ে কি করে তাদের দোষ বের করে তাদের আইনের কবলে ফেলতে পারে তারই চেষ্টা করছে। মদগর্বে গর্বিত হয়ে ইউরোপীয়ানরা প্রাইভেট মোটরে একস্থান হতে অন্যস্থানে চলে যাচ্ছে। একটু দূরে গিয়েই দেখতে পেলাম রকম রকমের পণ্য দ্রব্য বিপনীরাজিতে স্তরে স্তরে সজ্জিত হয়ে পথিকের দৃষ্টি আকর্ষন করছে। চীনা সুন্দরীরা তাদের প্রিয়তমদের সংগে যেতে যেতে সেই মনোরম দ্রব্য কিনে দিতে অনুরোধ করছে। পথের দুদিকে ফুটপাথ। ফুটপাথ

ধরে অনেক পথচারী চলছে। অনেকেরই ছিন্ন বস্ত্র। অনেকে রেশমীয় পোষাক পরে দ্রুত পদ-নিক্ষেপে দোকান হতে দোকানান্তরে চলে যাচ্ছে। পথের ঠিক মাঝখান দিয়ে ট্রলি বাস চলে যাচ্ছে। ট্রলিবাসে নানা দেশীয় লোক বসে দুদিকের দৃশ্য দেখছে। ধনী গরীব সমভাবে কেউ পেটের খোরাক আর কেউ মনের খোরাক অন্বেষন করছে। সকলেই ব্যস্ত। সকলেই যেন চায় কিছু কুড়িয়ে পকেটস্থ করতে কিন্তু সেই ছড়ানো জিনিষই বা কি এবং কি করেই তা কুড়াতে হয় তার সন্ধান কটা লোক জানে?

হংকং-এ নতুন বলে আমার কাছে কিছুই ঠেকল না। যাঁরা সিংগাপুর দেখেছেন তাদের কাছে হংকং নতুন নয়, পুরাতন। কিন্তু এই পুরাতনের মাঝেই আমি নতুন কিছুর অন্বেষণে ঘুরে বেড়াতে লাগলাম। নতুন কিছুই পেলাম না। পলিটিক্স সকলে করে না। চীন দেশের পলিটিক্স অন্য ধরণের। পলিটিক্স যারা করে তারা, যে পর্যন্ত ক্ষমতা তাদের হাতে না আসে, সে পর্যন্ত তাদের দেখা কেউ পায় না। আমার এদিকে কোনরূপ অভিজ্ঞতা অর্জন করা ধৃষ্টতা হবে মনে করে অন্যান্য বিষয়ে মন দিলাম।

আমাদের দেশের লেখকগণ প্রায়ই বিদেশী লেখা অনুবাদ করে অথবা বিদেশী চশমা চোখে দিয়ে চীনদেশ দেখেন এবং তাঁদেরই কথা নানা ভংগিতে লিখে বাহাদুরী অর্জন করতে চেষ্টা করেন। সন্ধ্যার পর থেকে আরম্ভ করে রাত্রি দুটা পর্যন্ত হংকং শহর বেড়িয়ে কোথাও বিশেষ কিছু দেখতে পেলাম না। আমাদের দেশের পণিকারা যেমন দরজার সামনে দাঁড়িয়ে থাকে এখানেও ঠিক সেইরূপ। নাবিক দেখলেই কতকগুলি অসৎ লোক নাবিকদের অসৎ স্থান দেখাতে নিয়ে যায়। আমাকেও টানা হেঁচকা করেছিল। যাঁরা এসব দেখেই

একটা জাতের উপর কাদা ছোঁড়েন তাঁরা নেহাৎই 'ভাল মানুষ'। তাঁরা জানেন না, পেটের ক্ষুধা মেটাবার জন্যই ক্ষুধার্ত খারাপ কাজ করতে দৌড়ে আসে। এসব ভালমানুষের দল যেমন কুকথায় পঞ্চ মুখ তেমনি তাঁরা তাদের অজানিত ভাবে সমাজের সমূহ ক্ষতি করেন। লেখক গল্প লেখে, গল্প অনুবাদ করে যদি চিরজীবি হতেন তবে এ সংসারে লেখকের নামের সংখ্যা অগনিত হত।

রাত আড়াইটার সময় যখন জাহাজে ফিরলাম তখন কেউ জেগে নেই। শুধু ব্রিজের কাছে একটি মাত্র লোক দাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্ছিল।

হংকং-এ অনেক মাল নামান হ'ল এবং কতক মাল বোঝাইও হল। এতে তিনটা দিন কেটে গেল। প্রত্যেক দিনই শহরে যেতাম এবং ঘুরে আসতাম। দিনের বেলায় হংকং তত ভাল বলে মনে হ'ল না। তবে কতকগুলি বিষয়ে চীনাদের সংগে আমাদের অতি নিকট সম্বন্ধ আছে বলেই মনে হল। যেমন পাল্‌কীর ব্যবহার। চীনারা ঠিক ঠিক পাল্‌কী ব্যবহার করে না তবে ঐ ধরণের একটা যান চারজন লোক বয়ে নিয়ে যায়। যে লোকটাকে চারজন লোক বয়ে নিয়ে যায় তাকে দেখলে রোগী বলে মনে হয় না, বরং মনে হয় লোকটা ধনী এবং ভোগী। পৃথিবীর মাঝে ভারতবর্ষে এবং চীন দেশেই ভোগীরা নিজের মানইজ্জত ভুলে গিয়ে নিজের জাতকে খাটো করে নিজেরা বেশ ভোগ করছিল এবং করছে। পৃথিবীর অন্য কোন জাত একরূপ বর্বরোচিত ব্যবহার নিজের জাতের লোকের উপর করেনি। পাল্‌কী প্রথা বর্বরতার বিশেষ একটি দৃষ্টান্ত। চীন দেশেই সর্ব প্রথম রিক্সার প্রচলন হয়। কিরূপে চীনদেশে এই বর্বরতা প্রচলিত হয় সেকথাই আমি অনবরত ভাবতাম।

কোনও এক যুগে কোন ইউরোপীয় লেখক লিখে গেছেন চীন দেশের লোক নৌকায় বাস করে। এ কথাটা মোটেই সত্য নয়। লোকে নৌকার সাহায্যে এক স্থান হতে অন্য স্থানে যাওয়া আসা করে মাত্র। তীরে গিয়ে বাস করার সুযোগ না পেলে নৌকায় রাত্রে ঘুমিয়ে থাকে। এরূপ নৌকায় ঘুমিয়ে থাকা নদী-বহুল দেশে এবং সমুদ্রতীর-বাসীদের মাঝে প্রায়ই দেখা যায়। আমাদের জাহাজের কাছে এমন অনেক নৌকা আসত যাতে শিশু পর্যন্ত দেখতে পেয়েছি। শিশুর মায়ের কাছে জিজ্ঞাসা করেছি এবং জেনেছি তাদের বাড়ি আছে। শিশুদের বাড়িতে দেখার মত লোক নাই বলেই নৌকাতে সংগে আনতে বাধ্য হয়েছে। অনেকে অনেক কথা অনুসন্ধান না করেই লিখে ফেলেন এবং সে অপ্রকৃত সংবাদ স্থবির লেখকগণ সংগ্রহ করে জন সমাজে প্রচার করে। অবশ্য চীন দেশে ঠিক সংবাদ সংগ্রহ করাটাও একটু কষ্টকর।

চীনারা বিদেশী লোকের সঙ্গে বিদেশী ভাষাতেই কথা বলতে ভালবাসে। বিদেশীর কাছে যখন তাদের নিজের ভাষা শুনতে পায় তখন তারা সে কথার জবাব না দিয়ে মুখ ফিরিয়ে রাখে। আমিও সামান্য কয়েকটি চীনা শব্দ জানতাম। ভুলেও আমি তা উচ্চারণ করিনি। একদিন সাম্পানে একটি চীনা শিশুকে দেখতে পাই এবং জাহাজ থেকে নেমে একখানা সামপান ভাড়া করে শহরের দিকে রওয়ানা হই। শহরে যাবার কোন ইচ্ছা ছিল না, তবুও গিয়েছিলাম শুধু সামপানের মাঝিকে বেশী পয়সা দেবার জন্য। কিনারায় পৌঁছে, কিনারা হতেই কয়েকটি শুকনা ফুল একটি দোকান থেকে [illegible] চলে এলাম এবং যে নৌকাতে শিশু দেখেছিলাম সে দিকে সামপান চালাতে বললাম। সাম্পানের নিকটে পৌঁছে আমি একবারো জিজ্ঞাসা করে ফেলিনি যে তাদের বাড়ি ঘর আছে কিনা। যে নৌকাতে শিশু

ছিল সেই নৌকা ভাড়া করার দরকার বলে দর করে থাকি। দর করার সময় এমনি ভাবে ভাড়া করতে লাগলাম, যাতে করে স্ত্রীলোকটি বিরক্ত হয়। স্ত্রীলোকটি বিরক্ত হয়ে বলল এটা ঘর নয়, এটা সামপান আমি তৎক্ষণাৎ বললাম তোমার কি ঘর আছে, যে ঘরের কথা চিন্তা করতে পার? যাদের ঘর আছে তারাই সংবাদ রাখে। তোমরা জন্মেছ সমুদ্রে, মরবেও সমুদ্রে।

স্ত্রীলোকটি আর ঠিক থাকতে পারল না। সে প্রথমেই আমার চৌদ্দ-পুরুষকে উদ্ধার করল তারপর বলল "আমার বাড়ি-ঘর সবই আছে।" স্ত্রীলোকটি যখন বলেছিল তার বাড়ি-ঘর সবই আছে তখন তার চোখ দিয়ে যেন আগুন বের হচ্ছিল। আমি আর সেখানে দাঁড়িয়ে থাকি নি।

চীন-দেশে গরীবদের বড়ই দুর্দ্দশা। স্ত্রীলোকদের প্রকৃতি ভিন্ন রকমের। যাঁরা স্ত্রী-চরিত্র নিয়ে বই লেখেন তাঁরা এদিকে একটু মন দেবেন। আমি এখানে নীরব থাকব। চীনা স্ত্রীলোক নানা কারণে নিজের ঘর থেকে অনেক দূরে থাকতে ভালবাসে। অত্যাচারী চীনা জমিদারের অত্যাচার চীনারা সর্বরকমে সহ্য করতে প্রস্তুত থাকে কিন্তু তাদের স্ত্রীলোকের প্রতি যখন জমিদারের দৃষ্টি পড়ে তখনই তারা বন জংগলে পালায়, নদী কাছে থাকলে সামপানে আশ্রয় নেয়। বিদেশী পর্যটক তত্টুকু সংবাদ নেবার দরকার মনে করেন না। যা মনে আসে তাই লিখে সুখী হন। চীনাদের হয়ে প্রতিবাদ করারও কেউ নাই। যারা প্রতিবাদ করার লোক তারাই অত্যাচারী। ভবিষ্যতে কিন্তু চীনের নদীতে অথবা সাগরে দিনের বেলায় কেউ এসে সামপানে থাকবে না। চীনারা সামাজিক উন্নতি বেশ তাড়াতাড়িই করে ফেলছে।

আমাদের জাহাজের মাল নামিয়ে ফের মাল বোঝাই হল। এবার আমরা যাব সাংহাই। সাংহাই দেখতে পাব ভেবে মনটা বেশ উৎফুল্ল হয়ে উঠলো। আমি জাহাজের নাবিকদের কাছে সাংহাইএর কথা জিজ্ঞাসা করতে লাগলাম। সাংহাইএর কথাশুনে কেউ সাড়াও দিল না যদিও বা কেউ কিছু বলল তা-ও মামুলী কথা। সমুদ্রে যারা বেশী দিন কাজ করে তাদের অন্তর শুকিয়ে যায়। তাদের বাসনার তৃপ্তি হয় না। তারা হয় একেবারে এক নম্বর লোভী। লোভী হলে কি হয়, লোভের ত' তৃপ্তি হয় না। তাদের বাসনা শুধু বেড়েই যায়। যাদের বাসনা বাড়ে তারা কথা খুব কম বলে।

জাহাজ ছাড়ল। আমরা আবার বাহির সমুদ্রে আসলাম। এবার প্রশান্ত মহাসাগরের ঢেউ আমাদের জাহাজকে কাঁপিয়ে তুলল। জাহাজখানা তৃণের মত ভেসে চলল। দু-দিনের মধ্যে তিনবার বিপদের ঘণ্টা বেজে উঠলো। বিপদ ঘটল না। আমরা বেঁচে গেলাম। ইচ্ছা ছিল কি করে বিপদ আসে তাই বলি, কিন্তু আমার তা বলার ক্ষমতা নাই। তৃতীয় দিন আকাশ পরিষ্কার হল। সমুদ্রতীর দেখা যেতে লাগল। নানা রকমের পাখী আকাশে উড়ে বেড়াতে লাগল। আমার কাছে:পথের সুখ বেশ ভালই লাগল।

অষ্টম দিন সকাল বেলা আমাদের জাহাজ ইয়াংসী নদীর মোহানায় আসল। ইয়াংসী নদীর মোহানা আর গংগা নদীর মোহানা একই রকমের। তবে গংগার মোহানায় জাহাজ যাওয়া-আসা অতি কম আর ইয়াংসীর মোহানায় জাহাজের যাওয়া-আসা এত বেশী যে পূর্বদেশে সাংহাই-এর মত দ্বিতীয় বন্দর আর একটিও নাই। যখন কোন বন্দরে জাহাজ পৌছায় তখন কত লোক কত বাসনা মনে পোষণ করে তার সংখ্যা নাই। প্রত্যেকটি বাসনার পিছনে রয়েছে

সুখ। অনেকে আত্মীয় দেখবে মনে করে বন্দরে পৌছে। যখন আত্মীয়ের দর্শন তারা পায় না তখন তাদের মন ভেংগে যায়। বন্দরে আসা অনর্থক ভাবে। সাংহাই বন্দরে কত লোক কত বাসনা নিয়ে আসছে কে জানে? কিন্তু কজনার মনের বাসনা পূরণ হবে তাই হল ভাবার কথা।

জাহাজে পাইলট উঠেছিল। আমি ভাবছিলাম পাইলট সোজা ভাবেই জাহাজের গতি বেখে চালিয়ে যাবে। কিন্তু তা করল না। আঁকিয়ে বাঁকিয়ে আমাদের ছোট জাহাজটাকে চালাতে লাগল। নদী গভীর না থাকার জন্যই সেরূপ করতে বাধ্য হয়েছিল। আমাদের জাহাজ ক্রমেই আগিয়ে গিয়ে সাংহাই নদীতে পড়ল। এবার জাহাজের ছড়াছড়ি। নদীর জল প্রবল বেগে ধেয়ে চলেছে। জাহাজ বেশ সোজা ভাবেই চলতে লাগল। মালবাহী জাহাজগুলি একটু দূরেই থাকে। সেজন্য সাংহাই নদীতে প্রবেশ করেই নিকটস্থ একটি ডকে আমাদের জাহাজকে ভেড়ানো হল। ব্রীজ হতে এবং নীচ হতেও সিড়ি ফেলে দেবার বন্দোবস্ত করা হচ্ছিল। চীনা কুলিদের বিলম্ব সহ্য হচ্ছিল না, এমন কি যারা কিছু বিক্রি করতে তীরে দাঁড়িয়েছিল তারাও কতক্ষণে জাহাজে এসে উঠবে সেজন্য ব্যস্ততা প্রকাশ করছিল। সিঁড়ি ফেলা হয়ে গেলে পংগপালের মত কতকগুলি লোক জাহাজে উঠলো। অফিসারগণ, বয়, খালাসী কেউ ফেরীওয়ালাদের কাছ হতে কিছুই কিনল না। ফেরীওয়ালারা ক্ষুণ্ণ মনে যখন ফিরে যাচ্ছিল তখন আমি একটি লোককে জিজ্ঞাসা করলাম "কি নিয়ে এসেছ?" লোকটি দাঁত বের করে হাসল, তারপর [illegible] তার কাছে নানারূপ ছবি আছে। তার কাছে যে [illegible] ছবি ছিল তা প্রকাশ্য স্থানে দেখাবার উপায় নাই। বুঝতে পারলাম

ছবিগুলি কি হতে পারে। তারপর শুধু ছবি নয়, সে ধরণের অনেক কিছুই আমাকে দেখাতে লাগল। প্রত্যেকটি আমি পরিত্যাগ করে ফেরিওয়ালাকে বললাম, বয় এবং পাঠকদের মাঝে গৃহস্থ-ঘরের ছেলেও আছে। সাংহাইএ এমন কিছু কি নাই যা দেখে বিশুদ্ধ আনন্দ পাওয়া যায়? ফেরিওয়ালা ধারণাও করতে পারল না বিশুদ্ধ আনন্দ কাকে বলে। আমি তাকে আর না ঘাঁটিয়ে বিদায় দেবার পূর্বে ভারতীয় ছোট একটি সিকি বকশিস্ দিলাম। সে সিকিটি পেয়ে বার বার আমাকে ধন্যবাদ দিতে লাগল। সুখের বিষয় পুনরায় সে তার প্রস্তাবিত বিষয়গুলির পুনরাবৃত্তি করল না।

জাহাজ হতে নামবার পূর্বে প্রত্যেকটি কেবিন বন্ধ করা হয়েছে কি-না তা' পরীক্ষা করে এলাম। যে পথ ধরে আমি চলছিলাম তার দুদিকের ঘরগুলি কোনটি এক তলা, কোনটি দোতলা। পথটা পিচ্ছিল এবং কর্দমাক্ত। সারি দিয়ে রিকসা চলাফেরা করছে। দু'এক খানা ট্যাক্সি যাত্রী নিয়ে তাড়াতাড়ি চলছে। ফুটপাথে নানা রকমের লোক নানা রকম কাপড় পরে আপন মনে আপন গন্তব্যস্থলে চলেছে। দেওয়ালে ঠেস দিয়ে শিশু, বৃদ্ধ এমন কি যুবকও দাঁড়িয়ে আছে। তারা কেউ "আমাকে কিছু দাও" বলল না, এমন কি হাতও পাতল না। তবে তারা ভিক্ষার উপরই নির্ভর করে তা বেশ বোঝা যায়। শিশুরা কাজ করতে পারে না, বৃদ্ধ অকেজো। এক যুবকদের কর্মশক্তি ছিল কিন্তু অনেক দিনের খাদ্যাভাবে তারাও অকেজো হয়ে পড়েছে। প্রত্যেকটি লোকের প্রতি বিশেষ করে লক্ষ্য করে দেখলাম এরা যেন হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে বসেছে। এরা পশুর মত। পশুও ক্ষুধা পেলে খাবারের অন্বেষণ [illegible] এদের সে চিন্তাও লোপ পেয়েছে। এদের এমন হল কেন তা কিন্তু [illegible] জিজ্ঞাসা

করতে সাহস হ'ল না, কি জানি কি চেয়ে বসে। এই শ্রেণীর লোক অনেক ডাইনে এবং বাঁয়ে রেখে চাপাই এলাকা পেরিয়ে আমি ইণ্টার-ন্যাসনেল এলাকায় পৌছলাম। এখানেও পথের দু পাশে সেরকম লোক দেখলাম বটে তবে অনুপাতে তাদের সংখ্যা খুবই কম।

ইন্‌টার ন্যাসনেল এলাকায় নানকিন রোড প্রসিদ্ধ স্থান। এখানে বিদেশীরা নানারূপ দৃশ্য দেখতে আসে। আমি তাই দেখতে এসেছি। আমারও পা এগিয়ে চলেছে। আমিও দু'দিকে দৃশ্যাবলী দেখে চলেছি। কিন্তু আমি যেন কিছুই দেখছি না বলে মনে হচ্ছিল। পথটির দু'পাশে নানা রকমের বিল্ডিং। নানকিন্ রোডের সবচেয়ে উঁচু বিল্ডিং বোধ হয় পনেরো তলা হবে। তবে কলকাতার মত পথের পাশেই কোথাও বস্তি নাই, এমন কি চীনা টাউনেও এক খানা বস্তি দেখতে পাইনি। বড় বড় বাড়িতে নানা রকমের হোটেল, কোনটাতে খাবারের দোকান আর কোনটাতে দরকারী বস্ত্র এবং অন্যান্য জিনিষ স্তরে স্তরে সাজানো। অনেকগুলি দোকানের দরজার পাশে সাজানো জিনিষও দেখলাম কিন্তু কোথাও আমার মন যেন খাপ খেতে চাইল না। শেষটায় একটা রেঁস্তরায় গিয়ে উঠলাম। একটি চেয়ারে বসা মাত্র বয়রা দৌড়ে এসে আমি কি চাইব বার বার জিজ্ঞাসা করতে লাগল। মামুলী খাবার আনতে আদেশ দিয়ে অন্যান্য আগন্তুকরা কি রকম এবং কোন দেশের কোন কোন জাতের লোক দেখতে লাগলাম। পৃথিবীর প্রায় সব জাতের লোকই সেখানে ছিল। কেউবা আনমনে তাকিয়ে আছে, কেউ[illegible]কাড়ি খাচ্ছে আর কেউবা সে-দিনের সংবাদ নিয়ে বেশ ধীরে ধীরে [illegible] বলছে। এখানে সবাই ভদ্র। ভদ্র মানে হ'ল এখানে যারা [illegible] তাঁদের প্রত্যেকেরই পকেটে কিছু [illegible]। ম্যানিলাগণ [illegible]

ভদ্রলোক হওয়া যায় না। পথের পাশে যে সকল নরপশুকে দেখে এলাম তারা মানুষ, কিন্তু তারা জড়-পদার্থ হয়ে গেছে। কেন তারা প্রত্যেকেই জড়-ভরত হ'ল সে কথার উত্তরে এদের অর্থাভাবেই একমাত্র কারণ সে কথা সকলেই বলবে। অতএব অর্থই হল ভদ্র এবং অভদ্র হবার মাপকাঠি। একদিন এমনও ছিল যে, যারা রাজা এবং মহারাজা তাদের ঘরেই টাকা পয়সা থাকত। এখন টাকা-পয়সার সীমা বেড়েছে সেইজন্য এই জড়ভরতদের পথের পাশে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়।

নানকিন রোড হতে ফিরে আসবার পথে একটা কদর্য দৃশ্য দেখে দাঁড়াতে বাধ্য হলাম এবং তথাকথিত ভদ্রতার সীমা লংঘন করে আবোল তাবোল বকতে লাগলাম। জানি না' কবে বৃষ্টি হয়েছিল কি বরফ পড়েছিল। পথে কিন্তু কাদার মতই কি দেখতে পাচ্ছিলাম। কাদার পাশেই একটা লোক মাটিতে বসে তার কামিজ হ'তে উকুন বের করে তাই খাচ্ছিল। সর্বপ্রথম লোকটাকে জিজ্ঞাসা করলাম এমন করছিস কেন? সে আমার কথার জবাব দিল না। তারপর পথচারীদের জিজ্ঞাসা করতে লাগলাম-একে কি কেউ সাহায্য করতে পারে না। এরূপ দৃশ্য রাজপথে কি দেখানো উচিত? এতে কি মানব সভ্যতার অবমাননা হয় না। আমার কথার কেউ জবাব দিল না। অনেকে হয়ত ভেবেছিল আমিও এই নরপশুটার মতই কিছু হব। শেষটায় আর সহ্য না করতে পেরে নরপশুটাকে উঠালাম এবং আমার সংগে চলতে বললাম। কিন্তু তার উঠবার ক্ষমতা ছিল না। উপায়ান্তর না দেখে লোকটার পাশে দুটি টাকা রেখে জাহাজে চলে এলাম। সাংহাই দেখার জন্য আর শহরে যাই নি। হকারে প্রত্যহ দৈনিক সংবাদপত্র জাহাজে দিয়ে যেত তাই মন দিয়ে পড়তাম আর সময় কাটাতাম। সাংহাই-এ দেখার মত আমার কাছে কিছুই ছিল না।

সাতটি দিন আমাকে জাহাজে কাটাতে হয়েছিল। নদীর বাতাস যেন আমার ভাল লাগছিল না, শরীর ক্রমেই দুর্বলবোধ হচ্ছিল। কখন জাহাজ বন্দর হতে বিদায় নেবে তাই বার বার ভাবছিলাম। অষ্টম দিন সকাল বেলা জাহাজ বন্দর হতে নোঙর উঠাল, আমিও হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম।

এবার আমরা জাপান যাব।

বেলা তিনটার সময় আবার আমরা চীন সাগরে এলাম অফিসারদের খাবার দিয়ে তাদের কেবিন ভাল করে পরিষ্কার করলাম। পাইখানাগুলি পরিষ্কার আছে কি না তা ভাল করে দেখলাম তারপর ডেকে গিয়ে আমারই রক্ষিত একখানা ইজি চেয়ারে বসে একবার আকাশের দিকে আর অন্যবার চারিদিকের সাগরের দিকে দেখতে লাগলাম। বয়, পাচক অথবা খালাসী এমন করে বসে থাকতে ভাল বাসত না। তারা কাজ করার পরই নিজেদের কেবিনে বসে কে কি করল এবং পরবর্তী বন্দরে গিয়ে কি করবে তাই নিয়ে কথা বলে। এদের কথার রকম দেখে আমি দুঃখিত হতাম এবং যাতে এদের উন্নতি হয় তারই চেষ্টা করতাম। এরা কিন্তু আমার কথা শুনত না। আমি ছিলাম মুসলমান। নতুন মুসলমানের কথা পুরাতন মুসলমানরা শুনতে চায় না। এদের আমার প্রতি অবহেলা দেখে আমি মনে মনে হাসতাম, মুখে কিছুই বলতাম না।

পরের দিন থেকে শুধু ঘোলাটে সমুদ্র আর নীল আকাশ। ঘোলাটে জল ক্রমেই নীল জলে পরিণত হতে লাগল। [illegible] সাগর [illegible] গভীর নয় বলেই ঘোলা জলে এবং নীল জলে যখন মিলতে [illegible] এবং ঘাত প্রতিঘাতে চক্রাকারে ঘুরে নীচের দিকে [illegible]

যায় তখন দেখতে বেশ আরাম লাগে। আমি এ সবই বসে দেখতাম আর ভাবতাম এবার জাপানটা একটু দেখতে পারলেই ভাল হবে। চার পাঁচ দিন এরূপ ছোট-খাটো দৃশ্য দেখেই কাটিয়ে দিলাম তারপর মনে হল সাগর যেন ক্রমেই গভীর হচ্ছে। সমুদ্র তীরে যে সকল পাখী বাস করে তাদের গমনাগমন লোপ হয়ে যাচ্ছে। কচিৎ দু একখানা জাপানগামী অথবা জাপান হতে অন্যত্র কোথাও যাচ্ছে এমনই ধরণের জাহাজের সংগে দেখা হতে লাগল। এরূপ ভাবে আরও চার পাঁচ দিন কেটে গেল। তারপর প্রায়ই জাপানী মাছ ধরার মোটর বোট গুলির সংগে দেখা হতে লাগল। মোটর বোটগুলির জেলেদের যেন জীবন নাই। তারাও আমাদের দেশের বকের মত মাছের দিকেই তাকিয়ে রয়েছিল। তাদের পাশ দিয়ে একটা জাহাজ চলে যাচ্ছে সে দিকে তাদের ভ্রুক্ষেপই নাই। আমাদের জাহাজ একখানা জাপানী জেলে-বোটের কাছ দিয়ে যাচ্ছিল। কয়েকজন লোক তাতে ছিল এমন কি একটি যুবতীও মাথায় লাল শালু কাপড় বেঁধে কি এক [illegible] প্রাপ্তির আশায় জলের দিকে তাকিয়ে ছিল। আমি সেই যুবতীকে পল্টনী কায়দায় নমস্কার জানালাম। যুবতী আমার দিকে তাকালও না। এতে আমি দুঃখিত হলাম না। [illegible]ওয়া আর পাওয়া নিয়ে সংসার। যুবতী মাছের দিকে চেয়ে রয়েছিল। আমার রূপও ছিলনা, দেবার মত টাকাও ছিল না। যুবতী আমার দিকে চাইবে কেন? তবে যুবতী সুন্দরী, যুবকগুলি সুপুরুষ, আর যে সকল প্রৌঢ় বসে রয়েছিল তাদের [illegible] মোটা হাড়ের উপর মাংসের অভাবে, তারা যে খাঁটি ব্রাউন মোংগোলিয়ান তাই বোঝা যাচ্ছিল। ব্রাউন মংগোলিয়ানদের [illegible] সুন্দর দেখায়। যেই তাদের প্রৌঢ়ত্ব এল অমনি যেন [illegible] [illegible] রং এবং গঠন বদলে গিয়ে অন্য কিছু হয়ে যায়।

দিনটি দেখতে দেখতেই কেটে গেল। দিনে বয়রা জাপানের গেইসা বালিকা, জাপানের বারবনিতালয় এ সব কথা নিয়েই বেশ আলোচনা করতে লাগল। আমি তাদের কথা কান দিয়ে শুনতে লাগলাম, এবং ভাবতে লাগলাম হয়ত বয়রা জাপানের এর বেশী কিছুই দেখে না, হয়ত আমি এর বেশীও কিছু দেখব।

সন্ধ্যা হয়ে গেছে। উত্তর দিক হ'তে ঠাণ্ডা বাতাস বইতে আরম্ভ করেছে। আমাদের জাহাজ মন্থর গতিতে চলেছে। পাইলটের জন্য সিঁড়ি নামিয়ে দেওয়া হয়েছে। পাইলট একখানা বড় ষ্টিম বোট নিয়ে প্রবল গতিতে আমাদের জাহাজের দিকে আসছে। অদূরে কতকগুলি জাপানী জেলে মোটর-লঞ্চের সাহায্যে মাছ ধরছে। আমাদের জাহাজ যেন তাদের জালের উপর না গিয়ে পড়ে সে জন্য জেলেরা বাতির সাহায্যে সিগ্‌নেল দিচ্ছে। বাতিগুলি লাল। দূর থেকে হাপরের চোখের মতই দেখাচ্ছে। পাইলট জাহাজে এসে উঠল। জাহাজের গতির পরিবর্তন হল, জাহাজ বন্দরের ভিতরে প্রবেশ করতে লাগল। বন্দরের নাম সিমনোসেকী। জাহাজ ডকে ভিড়ল না। দূরে নোঙর ফেলল। কতকগুলি জাপানী ম্যনি-চেন্‌জার এসে জাহাজে উঠল। তারা প্রত্যেকে জাপানী ম্যনি যাচাই করল। প্রত্যেকেই জাপানী টাকা কিন্‌ল। জাপানী টাকার নাম হচ্ছে ইয়েন্। আর পয়সার নাম হল কেন। আমি পাঁচটি মাত্র ইয়েন কিনলাম। এতে জাপানী লোকটি আমার দিকে চেয়ে একটু হাসল, তারপর বলল—এতে ত গ্রীণ-হাউস দেখা হবে না, আরও ইয়েন কিনুন। জাপানীকে বললাম আমি গ্রীণ-হাউসে যাবনা বলেই কম ইয়েন কিনেছি। বয়রদের কাছে গ্রীণ হাউসের কথা শুনেছিলাম। এসব কথা পাঠককে উপহার না দেওয়াই ভাল।

অফিসাররা একখানা মোটর বোটে বোঝাই হয়ে শহরে চলে গেল। পরের ট্রিপে কয়েকজন বয় এবং খালাসীও তীরে গেল। আমি জাহাজেই রইলাম। খাবার খেয়ে নিরিবিলিতে ডকের উপর বসে সিমনোসেকীর দৃশ্য দেখতে লাগলাম। অদূরে কে বসে বাঁশের বাঁশী বাজিয়ে জাপানী গান গাইছিল। জাপানী গান শুনতে মধুর নয়, তবে তাদের বাঁশী বাজানোটা আমাদের দেশের চেয়েও ভাল লাগল। আমি সেই বাঁশী শুনেই কেবিনে এসে শুয়েছিলাম। বেশ ঘুম হ'ল।

পরের দিন ঘুম থেকে উঠে ফের ডেকে গিয়ে সিমনোসেকীর আসল রূপ দেখলাম। পাহাড়ের পায়ে ক্রমেই কাঠের ঘরগুলি ঢেউ খেলে আকাশের দিকে ঠেলে উঠেছে। ছোট ছোট অলিগলি পথগুলি দৌড়ে এসে যেন ডকের সংগে মিলেছে। দু একখানা মোটরকার দেখতে পেয়ে ভাবলাম, জাপান শুধু খেলনা বানাতেই শিখেছে—এখন ও জাপানকে ফোর্ডের উপরই নির্ভর করতে হয়। তীরে গিয়েও দেখলাম ফোর্ড কোম্পানীর মোটরগুলিই চলা ফেরা করছে। সমুদ্র তীর হতে যে সকল স্বল্প-দীর্ঘ মোটা পথগুলি শহরের দিকে চলেছে তার দু পাশেই নানা রকমের চায়ের দোকান, কাঁচের দোকান, খাবারের দোকান রয়েছে। এক দিকে এক পাশে একটি রিক্সারও আড্ডা। রিকশা গুলি দেখলেই মনে হয় চীনের কথা কিন্তু লোকগুলিকে দেখলে সেরূপ কিছুই মনে হয় না। এদের পোষাকও একটু আশ্চর্য ধরণের। তাদের পায়ে যে ধরণের জুতা দেখলাম তা পৃথিবীর আর কেউ ব্যবহার করে না শুধু জাপানেই দেখা যায়। রিকশায় বসার আমার দরকার ছিল না তবুও যখন একটা রিকশা-পুলার আমাকে ডাকল, আমি তার ডাক অবহেলা না করে তারই কাছে গেলাম, সে আমাকে জিজ্ঞাসা করল.....
.........চাই নাকি?

না।

তবে যাবে কোথায় ?

শহর দেখতে।

রিকসায় বসবে ?

না।

আমি আব তার কাছে দাঁড়ালাম না। আমার পোষাক আর আমার কাজের প্রতি বেশ ঘৃণা হ'ল। যেখানেই যাচ্ছি সকলেই আমাকে শুধু বদ-কথা জানাবার জন্যই চেষ্টা করছে। বয়, খালাসী আগুনওয়ালা, মামুলী অফিসার এরা যেন ভাল কথা চিন্তাই করতে পারে না। এরা যেন শহরে পৌঁছা মাত্রই মদের দোকান কোথায় আছে তা আর চায় কামিনী। পথ দিয়ে যখন মাথা নিচু করে চলছিলাম তখন ভাবছিলাম হয়ত যারা সর্বপ্রথম আমাদের কাজ করেছে তারা এসব বিষয় নিয়েই থাকত বেশী এবং সেজন্যই সমশ্রেণীর লোক দেখলেই সাধারণ লোক ভাবে। এরা শুধু দূষিত আমোদ চায়, পারত তাদের ইপ্সিত জিনিষ দেখিয়ে দেও নতুবা এদের সংগ পরিত্যাগ কর। নাবিক জীবনটার প্রতি আমার বেশ ঘৃণা হ'ল। সিমনোসেকীতে আসার পর যারাই আমার সংগে কথা বলল তারাই আমাকে কুস্থানের সংবাদই দিতে লাগল। জাহাজে যে সকল লোক কাজ করে তারা যেন সুচিন্তা করতে জানে না।

পাহাড়ের গায়ের শহর সাধারণতই পরিষ্কার থাকে, সেজন্য এ শহরখানাও বেশ পরিষ্কার। ছোট গলিপথগুলিতেও যতটুকু [illegible] ততটুকুতে পিচ দেওয়া হয়েছে, তার পরই সিঁড়ি দেওয়া পথ। [illegible] শহরের ভেতরে গেলাম না। যতটুকু দেখার উপযুক্ত তাই [illegible]

এলাম। আমার মনে শুধু একই কথা আঘাত করতে লাগল, কেন পৃথিবীর লোক নাবিক শ্রেণীকে এত ঘৃণা করে?

বেলা দশটায় জাহাজ মোজী বলে একটি ছোট শহরে একটু দাঁড়াল এবং কতকটা কয়লা উঠাল। আমাদের জাহাজে যারা কয়লা উঠিয়ে দিল তারা ছিল স্ত্রীলোক মজুর। স্ত্রীলোক মজুর সাধারণতঃ ডকে দেখা যায় না, তাই স্ত্রীলোক মজুর কি করে শরীর খাটিয়ে ডকে কাজ করে তাই লক্ষ্য করতে লাগলাম। আচার এবং নিষ্ঠা বলে যদি কিছু থাকে তবে তার চাক্ষুষ অনুভব হয় স্ত্রীলোকদের মাঝে। এক একটি ঝুড়ি কয়লা ডক হতে উঠিয়ে একটি নারী অন্য নারীর হাতে দিচ্ছিল আর সেই কয়লা আমাদের জাহাজের বাংকে পৌঁছে যাচ্ছিল। একটি কয়লার টুকরাও মাটিতে পড়ছিল না। পুরুষ লোক যদি এই কাজটি করত তবে অনেক কয়লা তারা ইতস্তত নিক্ষেপ করত এটা নিশ্চয় কথা। স্ত্রীলোকের কয়লা উঠানো ছাড়া মোজীতে আর কিছুই দেখতে পেলাম না, জাহাজ ছেড়ে দিল এবং বেশ মন্থর গতিতে চলে তৃতীয় দিন কোবিতে এসে উপস্থিত হল। এবার আমরা তিন দিন ছুটি পাব। ভাবলাম নাবিক শুধু অপকর্মই করে। কারো কাছে কোন ভাল কথা জিজ্ঞাসা করলেও উল্টা বুঝে এবং খারাপ পথই দেখিয়ে দেয়। নাবিক বেশে যতক্ষণ থাকব ততক্ষণ আমার দিকে কেউ সুদৃষ্টিতে চাইবে না। এখন থেকে বোবার মত পথে হাঁটব এবং শুধু দেখতেই চেষ্টা করব। এর বেশী আমার করার কিছুই থাকবে না।

কোবিতে কতগুলি লোক রিকসা টানে। এদের হাব-ভাব এবং চাল-চলন দেখে সাধারণ লোক বলে মনে হল না। যারা বিশেষ লোক হয় এবং ছদ্মবেশে থাকে তাদের কাজে নিযুক্ত করতে ইচ্ছা

হয়। তাই একটি রিকসা ভাড়া করতে গেলাম। রিকসা-পুলার আমাকে দেখেই বলে বসল "এখনও সময় হয়নি। এযে মাত্র দশটা বেজেছে, বারবণিতারা এখনও শুয়ে আছে।" আমি রিকসা-পুলারকে বললাম "আমাকে একটা খাবারের দোকানে নিয়ে চল খাবার বোধ হয় এখন পাওয়া যাবে?" "সহস্র ধন্যবাদ মহাশয়, চলুন খাবারের দোকানে নিয়ে যাচ্ছি।" রিকসা-পুলাররা সাধারণত. ভদ্রলোকের সংগে কোনরূপ দরদস্তুর করে না। কিন্তু আমার শরীরে জাহাজী পোষাক থাকার জন্তই রিকসা জানিয়ে দিল, খাবারের দোকানে যাবার ভাড়া দুই ইয়েন লাগবে। আমি তাতেই রাজি হলাম। চীনা রিকসাতে দুজনও বসা যায়। জাপানী রিকসাতে একজনের বেশী বসতে পারা যায় না। রিকসার সিটের পিছনে ইংলিশে তাই লেখা ছিল। পথ দিয়ে যাবার বেলা এই বিজ্ঞাপনটুকু আমার দৃষ্টিপথে এসেছিল। পথের দুদিকেও চেয়ে দেখছিলাম। শুধু কাঠের ঘর সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। লোকে বলে জাপানে পিস-বোর্ডেরও ঘর আছে, আমি কিন্তু পিসবোর্ডের একখানা ঘরও দেখতে পেলাম না। দেখতে দেখতে সময় চলে যাচ্ছিল। আমরা একটি জাপানী খাবারের দোকানের সামনে এলাম। খাবার ঘরে পৌঁছে দেখি ইউরোপীয় খাদ্য জাপানীরা বসে খাচ্ছে। আমি হলাম জাহাজের বয়। ইউরোপীয় খাদ্য রোজই আমি খাই। জাপানী খাবার চেখে দেখতে এসে এলাম ইউরোপীয় খাদ্যের রেঁস্তোরায়। রিকসা হতে নেমে জাপানী রিকসা-পুলারকে তার পাওনা দুই ইয়েন দিয়ে বিদায় করেছিলাম। কথা বলার আর লোক পাব কিনা তাই ভাবছিলাম, এমনি সময় হোটেলের একটি বয় এসে আমাকে বলল "মাননীয় মহাশয়, আপনাকে কোন মতে কি সাহায্য করতে [illegible]

আমি বললাম "আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানবেন, আমি এসেছিলাম জাপানী খাবার খেতে; রিকসা চালক আমাকে পৌঁছিয়েছে আপনাদের এখানে, আমি একটি জাপানী খাবারের দোকানে যেতে চাই। দয়া করে যদি একটি জাপানী খাবারের দোকান দেখিয়ে দেন তবে বড়ই বাধিত হব।" জাপানী বন্ধু আমাকে পাশেরই একটি দোকানে নিয়ে গিয়ে দোকানের মালিককে জাপানী ভাষায় কি বলে দিল তারপর আমার দিকে চেয়ে বলল, "এই সম্মানিত ভদ্রলোক আপনার কাছে জাপানী খাদ্য বিক্রয় করবেন তার বন্দোবস্ত আমি করেছি, এখন আমি যাই, বিদায় সম্মানিত ভদ্র মহাশয়।"

লম্বা একটা কাঠের ঘর। কাঠের মেজেটা এতই পরিষ্কার এবং মসৃণ যে পায়ে মোজা থাকার জন্যই পিছলিয়ে পড়িনি। বাইরে জুতা খুলে ঘরের ভেতর গিয়ে মেজের উপরই আসন করে বসলাম। কি খাওয়া হবে জানতে পারলাম না, ঘরটার আশে পাশে বেশ ভাল করে তাকিয়ে দেখলাম। ঘর খানা বেশ পরিষ্কার। ঘরের এক কোণে দুজন জাপানী খাচ্ছিল তাদের পাশে বসে একজন মহিলা কি ভেঙ্গে তাদের পাতে দিচ্ছিলেন এবং তারা দুটি কাঠির সাহায্যে তাই মুখে দিচ্ছিল। কতক্ষণ পর অন্য আর একজন মহিলা আমার কাছে কতকগুলি খাদ্য এনে রাখলেন এবং তৎক্ষণাৎ চলে গেলেন। কতক্ষণ পর সেই মহিলাই পুনরায় একটা উনুন এবং কতকগুলি চালের গুঁড়ি নিয়ে আমার কাছে বসলেন এবং আমাকে মাটি ছুঁয়ে "প্রণাম" করলেন। তারপর আমার দিকে চেয়ে বেশ হেসে মুখে খাবারের থালাটা এক খানা জলচৌকির উপর রেখে দিয়ে খেতে ইংগিত করলেন। বড় থালাতে কোয়ামুলা, মুলো

সিদ্ধ, লাউপাতা সিদ্ধ, ছোট ছোট মাছ ভাজা এবং এক পাশে ভাতও ছিল। জাপানী প্রথায় একটা বড় কাপে কিছুটা ভাত নিয়ে তাই মূলাসিদ্ধ দিয়ে কিছুটা খেলাম। তারপর মাছভাজা হাত দিয়ে উঠাতে যাচ্ছি এমনি সময় স্ত্রীলোকটি ছি, ছি, বলে অস্ফুট চীৎকার করে উঠলো। আমি কিন্তু ছোট মাছ-ভাজাগুলিকে দু'খানা কাঠির সাহায্যে উঠিয়ে মুখে দিতে পারছিলাম না। অবশেষে জাপানী স্ত্রীলোকটি দুটি ছোট মাছ আমার মুখে দিয়ে দিল। মাছভাজা অথবা মূলা সিদ্ধতে নুন না থাকায় জাপানী খাদ্য আমার কাছে অখাদ্যে পরিণত হয়েছিল। আমি আর খেলাম না। ইংগিতে চালের গুঁড়ি পাক করতে বললাম। স্ত্রীলোকটি গুঁড়িতে জল ঢেলে দিয়ে দু'খানা কাঠির সাহায্যে একটু নাড়ল তারপর তাই একখানা মাটির প্লেটে ঢেলে দিয়ে আগুনের উপর রেখে দিল। কতক্ষণ পর তাই একখানা পিঠায় পরিণত হল। সেরূপ পিঠা দেশেও খেয়েছি। তবে সেরূপ পিঠার সংগে যে কোন রকমের একটু মিষ্টির সংযোগ না হলে অখাদ্যই হয়ে যায়। চিনি অথবা গুড়কে কি বলে জানতাম না বলেই তা আর চাওয়া হল না, সামান্য একটু পিঠা খেয়েই উঠতে বাধ্য হলাম। এই সামান্য খাবারের দাম স্ব-ইচ্ছায় দুটি ইয়েন দিয়েছিলাম। অনেকেই হয়ত জিজ্ঞাসা করবেন কিছু না খেয়েই দু-ইয়েন মানে আড়াই টাকা দিতে হ'ল, সে কেমন কথা! এসব কথার উত্তরে বলছি "মিষ্টি হাসিরও একটা দাম আছে।" আমি মিষ্টি হাসির দাম দিয়ে হাঁপ ছেড়ে পথে বের হয়ে পড়লাম। প্রতিজ্ঞা করলাম আর কখনও জাপানী খাদ্য খেতে যাব না।

কথা বলে সমূহ বিপদে পড়তে হয়েছিল সেজন্য আর কোথাও কথা বলব না ঠিক করলাম। এবার শুধু হাঁটব আর দেখব কোথায় কি হচ্ছে।

বেলা হয়েছে, দলে দলে লোক সমুদ্রে স্নান করার জন্য রওনা হয়েছে। আমি তাদের পিছন না নিয়ে যে দিকে কেউ যায়না সে দিকেই যেতে লাগলাম। যে পথটাতে চলছিলাম তাতে লোক কমই চলছিল। তোমরা হয়ত ভাববে এবার শুরু হল এড্‌ভেন্‌চার। এড্‌ভেন্‌চার আরম্ভ হ'ল না। আমি এসে পড়ছিলাম একটি বাঁদর নাচের ঘরে। অনেকগুলি লোক সে ঘরে বসে বাঁদর নাচ দেখছিল। আমিও পন্‌চাশ সেট্‌ দিয়ে একখানা টিকিট কিনলাম। আমাকে বেশ ভাল সিটে বসতে দেওয়া হল, কারণ পন্‌চাশ সেট্ হল সবচেয়ে দামী সিট।

বাঁদর নাচ শেষ হতে আধ ঘণ্টার বেশী ছিল না। তবুও আধ ঘণ্টার মাঝে যা দেখলাম তাতেই জাপানীদের বাহাদুরী আছে বলেই মনে হয়। প্রত্যেকটা বাঁদর নানারূপ আদেশ মত কাজ করে যাচ্ছিল। আমাদের দেশের যাবা বাঁদর নাচায় তারা পথে ঘাটে বাঁদর নিয়ে চলা ফেরা করে, জাপানে তা করবার উপায় নাই। বাঁদর নাচের ঘর আছে সেখানে গেলেই বাঁদর নাচ দেখতে পাওরা যায়। আমাদের দেশে বাঁদর শ্বশুর বাড়ী যাবার দৃশ্য সকলেই দেখেছ, জাপানেও বাঁদরকে শ্বশুর বাড়ী. .পাঠান হয়, মাছ ধরান হয়, পথ ঘাট পরিষ্কার করান হয়. এরূপ অনেকগুলি বাঁদর নাচ দেখে যখন বের হয়ে এলাম তখন কেবলই মনে হতে লাগল সেই লোকটার কথা যে অনেকক্ষণ বসে বাঁদর নাচাল। তার মুখ চোখ কেশগুলি শুষ্ক, চোখের দৃষ্টি অনেকটা পাগলের মত; কথা বলার ভংগিও যেন অনেকটা বাঁদরের মতই হয়ে গিয়েছিল। আমি আর কিছুই না দেখে জাহাজে চলে এলাম। আজকার দিনটাই অনর্থক গেল। শরীরও ভাল ছিল না, তাই অনেকক্ষণ ঘরেই থাকলাম।

সন্ধ্যার পর ঘুম থেকে উঠেই দেখি সাগরের তীরের বিজলী বাতিগুলি এমনি ভাবে আলো বিতরণ করছে যাতে করে মনে হল এমন আলোকিত সমুদ্রতীর আর কোথাও দেখিনি। তাড়াতাড়ি করে শহরের দিকে রওনা হলাম। বিজলী বাতির সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে চলতে লাগল। তারপর আসলাম একটি পথের মধ্যস্থলে। দুদিকের বিজলী বাতির গরমে শরীর হ'তে ঠস্ ঠস করে ঘাম বেরুতে লাগল। এরূপ অত্যুগ্র বিজলী বাতিতে বেশীক্ষণ থাকা আমার পক্ষে সম্ভব হল না। পথটা হেঁটে বেড়াতে লাগলাম। কলের মানুষ, কলের রেলগাড়ী ছোট ছোট থালার উপর রাখা হয়েছিল। কলের পুতুলগুলি এমনি সুন্দর করে নাচতে লাগল, যাতে করে মনে হয় যেন লিলিপুট নাচ্‌ছে। নানারূপ চিত্তাকর্ষক দৃশ্য দেখে পথটি পরিত্যাগ করতে বাধ্য হলাম কারণ আমার হার্টে এতে যেন ক্রমাগতই আঘাত লাগছিল। যার একবার ক্ষয়রোগ এসে দেখা দেয় তার পক্ষে বেশী আরামের স্থানেও থাকতে ভাল লাগে না। ক্ষয়রোগ বোধ হয় কলকাতাতেই আয়ত্ব করেছিলাম। সিংগাপুর, পোণাং, শ্যাম এসব স্বাস্থ্যকর স্থানে থাকার জন্য আমাকে কাবু করতে পারেনি, কিন্তু ঐ যে কয়দিন উপবাস করে ছিলাম তারই ফলে শরীর দুর্বল হ'য়েছিল, রোগের প্রকোপও বেড়েছিল। জাহাজে আসার পরই শরীর ভালর দিকে চলছিল। কিন্তু যখনই বেশী কাজ করতাম তখনই যেন শরীরে অবসাদ আসত। আজও আমার শরীরে বেশ একটা অবসাদ আসছে তাই কিছুই ভাল লাগছিল না।

শহর পরিত্যাগ করে আবার সাগরতীরে গেলাম, জাপানী [illegible] বিরক্ত হ'য়েই সাগর জলে শরীরটাকে ডুবিয়ে রাখলাম। [illegible]

শরীরে বেশ আরাম পেতে লাগলাম, কিন্তু একটা পুলিশ এসে কিচির মিচির করতে লাগল। তার পিস্তল হতে দুটো গুলি বেড়িয়ে আকাশের দিকে গেল। আমি প্রমাদ গুণলাম। সাগর জল হতেও উলঙ্গ অবস্থায় উঠতে পারছিলাম না। এ জীবনে সজ্ঞানে আজিই আমি বিবস্ত্র হয়েছি, তাই ভেবে পাচ্ছিলাম না এ বিপদে কি করে লজ্জা নিবারণ করি। অন্য একটা পুলিশ এসে আমার উপর টিপ বাতির আলো ফেলল। আমি জলে ডুব দিলাম। তবু এরা গেলন না দেখে বিবস্ত্র অবস্থাতেই জল থেকে উঠে পুলিশকে বললাম "ভয়ানক গরম লেগেছিল তাই একটু স্নান করছিলাম।" পুলিশ বলল তারা ভেবেছিল কোন যুবক তার প্রেমিকাকে না পেয়ে সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়েছে।" তিন জনে বেশ হাসলাম। আমাদের দেশে অনেক যুবক যুবতী বিফল মনোরথ হয়ে যেমন নিজকে মেরে ফেলে জাপানেও তা ঘটে। এদিক দিয়ে আমরা জাপানের সমকক্ষ তা আমি বলবই। রাতে জাপানী সমুদ্রে কেউ স্নান করে না। যারাই স্নান করতে যায় ধরে নিতে হবে সে আর ফিরে যাবে না। এডভেনচার এবং থ্রিল আমার মোটেই ভাল লাগত না, সেজন্য এরূপ যাতে আর না ঘটে সে জন্য মনে মনে একটি সিদ্ধান্ত করে নিলাম। জাহাজ কাছেই ছিল, তাড়াতাড়ি করে হেঁটে গিয়ে জাহাজে উঠলাম এবং সমাগত জাপানী ব্যবসায়ীদের সংগে জিনিষ কেনার বাহানা করে নানারূপ কথার ভেতর দিয়ে তাদের দেশের নানারূপ সংবাদ নিতে লাগলাম।

কোবিতে এসেই বুঝলাম আমার শেষ আরম্ভ হয়েছে। যদি [illegible] থাকতাম তবে হাঁপিয়ে পড়তাম, কাজ পরিত্যাগ করতাম। লোকে আমাকে এমনই শুনাত যাতে করে আমি তাড়াতাড়ি মরে

যেতাম, এখানে তা নাই। এখানে আমার রোগের কথা আমিই শুধু জানতাম আর ভাবতাম লণ্ডনের কথা। কখন লণ্ডন যাবো এবং হাসপাতালে গিয়ে শোব। বিশ্রাম নেবার জন্য আর শহর দেখতে যেতাম না শুধু তাই নয়, একটু মজা করবার জন্য শহরে গিয়ে শহরের লোকের মাঝে কোন রোগ ফেলাব এটাও বিচার্য বিষয় ছিল। আমাদের জাহাজ নাগোয়া, ইয়াকোহামা হয়ে আমেরিকার দিকে রওনা হল।

প্রশান্ত মহাসাগরের সৌন্দর্য আমি বলতে পারব না কারণ প্রশান্ত মহাসাগরের সৌন্দর্য বলার ভাষা আমার নাই। জাপানের কাছেই একটি গভীর সমুদ্র। গভীর সমুদ্র গাঢ় নীল হয়। তাতে তরংগ থাকে প্রচুর। আমাদের জাহাজখানা একটি শুকনা পাতার মত সাগরে ভেসে চলল। ক্রমাগত চলতে লাগলাম। চারিদিকে নীল সমুদ্র আর উপরে নীল আকাশ। গরম মোটেই নাই। উত্তরের বাতাস এসে আমার শরীরে লাগছিল আর শরীরটা নেচে উঠছিল। আমার শরীরের শক্তি ফিরে আসছিল। আমার ভাববার শক্তি বেড়ে চলছিল। আমি দেখছিলাম ঊর্ধ্ব আকাশে কতকগুলি পাখী আমাদের সংগেই যেন চলেছে। জানতাম এসব পাখী ঘণ্টায় পঞ্চাশ মাইল চলতে পারে। সমুদ্র তীর তাদের কাছে অতি কাছে। তবুও তাদের দিকে চেয়ে থাকতাম। যখনই ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ন্ত মাছ আকাশে উড়ত তখনই এই পাখীগুলি মাছের উপর ঝাঁপিয়ে পরত। আমার কাছে দুরবীণ ছিল না সেইজন্যই বুঝতে পারতাম না, কটা উড়ন্ত মাছকে অপরিচিত পাখী ধরতে সক্ষম হয়েছিল। একটা দুরবীণ পাবার জন্য তখন বেশ আগ্রহ হ'ত, কিন্তু সে বা[illegible] তাড়াতাড়ি পরিত্যাগ করতাম। আমি জানতাম আমার আশা বাড়িয়ে

কোন লাভ নেই। কারণ আমার মত লোকের পক্ষে একটা দুরবীন সংগ্রহ করা সহজ না হলেও ব্যায়সাধ্য ছিল।

সমুদ্রে এরূপ দৃশ্যাবলী দেখে কয়েক দিন বেশ আনন্দেই কেটে গেল। হঠাৎ একদিন ঠিক বারটার সময় যখন অফিসারগণ দুপুরে খাবার খেতে আসবে ঠিক তেমনিসময় জাহাজখানা মচ্ মচ্ করে উঠল। যেন কোনও কিছুতে আঘাত পেয়েছে। সাগরে প্রবল ঢেউ ছিল। ঢেউগুলি কোথায় লয় পেয়ে গেল। বাইরে এসে দেখি হাঁড়িতে দুধ জাল দেবার সময় দুধ যেমন ফেনিয়ে উঠে তেমনি করে সাগরের জল নীচ থেকে ফেনিয়ে উঠছিল আর জাহাজখানা ক্রমেই কেঁপে কেঁপে অতি ধীর গতিতে সামনের দিকে আগিয়ে চলছিল। ছোট বেলার কুসংস্কার আমার বেশ ছিল কারণ সাগর সম্বন্ধে আমার কোনও অভিজ্ঞতা ছিল না। অন্যান্য বয়দের জিজ্ঞাসা করলাম এরূপ হচ্ছে কেন রে? তারা সবাই বললে "জলদেবতা আমাদের প্রতি কুপিত হয়ে আমাদের পথ রুদ্ধ করে দাঁড়িয়েছে হয়ত এবার জাহাজ ডুববে। সমুদ্র জ্ঞান যাদের নাই তারা নিশ্চয়ই বলবে এটা জলদেবতারই কাজ। কিন্তু জলদেবতা খেলা করে শুধু মূর্খ ভারতবাসী এবং আরবদের অন্তরেই। ইউরোপীয় চীনা অথবা জাপানীদের অন্তর হতে জলদেবতার স্থান উঠে গেছে কারণ তারা এখন জেনেছে সাগরে এমন কেন হয়? যতক্ষণ কিছুই জানা হয় না ততক্ষণই বন দেবতা, জল দেবতা, রোগ দেবতা আমাদের মন দখল করে বসে থাকে।

এক ঘণ্টার মাঝেই আমরা এমনি স্থানে এসে পৌঁছুলাম যেখানে [illegible] অবস্থা সাধারণ অবস্থায় পরিণত হয়েছিল। যারা আমা[illegible] [illegible] উঠে দাঁড়ালো, যে সকল খালাসী ভয়ে ভীত হয়ে [illegible] তাদের [illegible] প্রাণ [illegible]। যাদের মুখ হতে একটা কথা বের হচ্ছিল না

তারা এখন নানা দুর্ঘটনার কথা বলতে প্রয়াসী হল। জাহাজে নব জীবনের সূচনা হল। শুধু অফিসারগণের মনের পরিবর্ত্তন হল না। তারা এই তথাকথিত দানবের স্থানে যতক্ষণ ছিল ততক্ষণ যেন বেশ উৎসুক্য প্রকাশ করছিল। এখন তাদের মুখে সে ভাব নাই। তারা যেন কিছু হারিয়েছে। তারা যা হারিয়েছে, যেন ফিরে পেতে চায় শুধু কর্তব্যের অনুরোধে তারা এগিয়ে চলছে।

তারা কি হারিয়েছে তাই আমি জানতে চেয়েছিলাম। আমাদের লোক সে কথা কোন মতেই বলতে পারল না। মিঃ মরিসনকে বিকাল বেলা সে কথা জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন তোমাদের লোক কি বলে? তাদের মাঝে অনেকেই বহু বৎসর সাগরে কাটিয়েছে। আমাদের লোক যা বলেছে তা মরিসনকে, বললাম। মরিসন বললেন তোমাদের মত শিক্ষিত সম্প্রদায়ও কি তাই বলে? যদিও আমি জানতাম আমাদের দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় চন্দ্র গ্রহণ এবং সূর্য্য গ্রহণ এর সময় গংগা স্নান করে পাপ দূর করে এবং পুণ্য অর্জন করে তবুও দেশের বদনাম যাতে না হয় সেজন্য বললাম আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের লোক জাহাজে কাজ করেনা বলেই এবিষয়ে আমি সম্পূর্ণ অজ্ঞ। মরিসন বললেন এদিকে ভূমিকম্প হয়েছে সেজন্যই যা দেখেছ তাই ঘটেছে। জাপান হতে আমরা বেশী দূরে আসিনি। জাপানের কাছের সাগরটী পৃথিবীর একটি গভীরতম সাগর। এদিকে প্রায়ই ভূমিকম্প হয়। সুখের বিষয় তোমার সর্বপ্রথম সমুদ্র যাত্রাতেই একটী বিশেষ ঘটনা ঘটল যা স্মরণ করে সুখী হতে পারবে।

এই ঘটনা ঘটবার আরও সাতদিন পর আমাদের জাহাজ স্যান ফ্রানসিস্কো, লস্-এন্জেল্ হয়ে পানামা খালে পৌঁছল। উল্লিখিত দুটী বন্দরে আমরা কেহই নামবার অধিকার পাইনি এমন কি বিখ্যাত

নিউইয়র্ক নগরীতেও না ; সেজন্যই নতুন মহাদেশের কথা কিছুই বলতে পারলাম না। এতে দুঃখিত হবার কিছুই নাই, যারা ভ্রমণ কাহিনী পড়ে অভিজ্ঞতা অর্জন করতে চায় তারা ইচ্ছা করলেই বড় বড় পর্য্যটকদের ভ্রমণ কথা পাঠ করে সে অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারে।

নিউইয়র্ক হতে আমরা বোষ্টন আসি এবং সেখান থেকে আমরা আটলাণ্টিক মহাসাগর পাড়ি দেবার জন্য প্রস্তুত হই। প্রশান্ত মহাসাগর পাড়ি দেবার সময় একজন ভারতীয় খালাসী জাহাজের অগ্রভাগে দাঁড়িয়ে থাকে। এই লোকটি দাঁড়িয়ে দেখত, জাহাজের অগ্রভাগে কোনরূপ বিপদের সম্ভাবনা আছে কি না। আটলাণ্টিক মহাসাগর পাড়ি দেবার সময় ইণ্ডিয়ান খালাসীকে সে কাজ হতে সরিয়ে দিয়ে একজন করে বৃটিশ অফিসার পালাক্রমে সে কাজ করতে লাগল। অতি সাবধানতার পেছনে অতি নিশ্চয় বিপদের সম্ভাবনা ছিল। জাহাজের প্রত্যেকটি নাবিক মরণ ভয়ে ভীত হয়ে ভগবানের কথাই চিন্তা করছিল। আমার সে চিন্তা ছিল। না কারণ আমি জানতাম আমার মরণ অতি সন্নিকটে। যদি জাহাজ ডুবে মরি তবে ক্ষতি কি ?

কয়েক দিন চলার পরই হঠাৎ একদিন অন্ধকার রাত্রে বিপদের ঘণ্টা বেজে উঠল। প্রত্যেকেই লাইফ বয় লাগিয়ে জাহাজের বাহিরে এসে স্ব স্ব নৌকার কাছে এসে দাঁড়াল। আমিও আমার নির্দ্ধারিত নৌকার কাছে এসে দাঁড়ালাম। জাহাজের উত্তর দিকটা অন্ধকার রাত্রেও বেশ আলোকিত হয়েছিল। একটা শুভ্র আলো সকলের নাকে মুখে এসে পড়ায় সকলের মুখই দুধের মত সাদা দেখাতে লাগল। এবার কিন্তু আমার সাথী ভাইরা কেহই ভূত প্রেতের কথা বলল না। তারা আমাকে জানিয়ে দিল সামনেই একটা বরফের পাহাড়। এটাকে এড়িয়ে যেতে পারলেই বিপদের সম্ভাবনা থাকবে না। আমাদের

জাহাজও যাতে করে আইস্ বর্গের উপর না গিয়ে পড়ে সেজন্য প্রাণ পণ চেষ্টা করতে লাগল। অবশেষে ঠিক ভোরের বেলা আমরা নিরাপদ স্থানে এসে পৌছলাম। মণবার পূর্ব্ব এটাও একটা অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলাম।

আঠার দিন পর আমাদের জাহাজ লিভারপুল এসে লাগল। আমাদের প্রত্যেককে ছুটি দেওয়া হল। কথা ছিল সাতদিন ছুটিতে আমরা লিভারপুল শহরটি ভাল করে দেখতে পাবব। যাব ইচ্ছা সে জাহাজে ফিরে যাবে, আর যার ইচ্ছা না হবে সে শহরেই রাত ও কাটাতে পারবে। আমার জাহাজে ফিরে যাবার মতলব ছিল না, সে জন্য জাহাজ হতে নেমেই লণ্ডনের টিকিট কিনে লণ্ডন আসলাম এবং লণ্ডনে এসে টেক্সি যোগে পপ্লারে গিয়েছিলাম। পপ্লারে আমার পরিচিত অনেক বন্ধু ছিলেন। তাদেরই সাহায্য নিয়ে থাকবার স্থান করে নিয়ে যাতে করে আরও কয়েকটি বৎসর জীবিত থাকতে পারি তারই বন্দোবস্তে মন দিলাম। ইংল্যাণ্ডে ষ্টো-এ-ওয়ে আইন আরোপীত হবার নিয়ম নাই কারণ গ্রেট বৃটেনে যে কোন দেশের লোক পা দেবা মাত্র সে বৃটিশের মতই নাগরীর হয়ে যায়। বৃটিশ নাগরীক বৃটেনে ষ্টো-এ-ওয়ে হয় না। আমারও সে ভয় ছিল না, সেজন্য প্রকাশ্যেই আমি থাকতে লাগলাম এবং যে পর্য্যন্ত কম ক্ষমতা থাকে সে পর্য্যন্ত যাতে আমি কাজ করতে পারি তারই চেষ্টা করতে লাগলাম।

কাজ পাওয়া গেল। কাজ মন দিয়ে করতে লাগলাম। হঠাৎ একদিন মুখ দিয়ে কতকগুলি টাটকা রক্ত বেরিয়ে আসল। টাটকা রক্ত দেখে মনে হল আমার শরীর আর বেশীদিন টিকবে না। বিলম্ব না করে সেদিনই ক্যালিডোন হাসপাতালে ভর্ত্তি হলাম এবং যাতে করে রোগ ভুলে থাকতে পারি সেজন্য নানারূপ বই পড়ে সময়

ক্ষেপণ করতে লাগলাম। মাঝে মাঝে ভ্রমণ কথাও লেখতাম। এতেই আমার দিন কেটে যেত।

দেখতে দেখতে তিনটি মাস কেটে গেল। আমার শরীর সবল হয়ে উঠলো, আমাকে হস্‌পিটাল হতে ডিসচার্জ করা হল। আমি হস্‌পিটাল হতে বের হয়েই সরাসরি বৃটিশ নাগরীক হবার জন্য আবেদন করলাম। নিয়ম ছিল যে কোন বৃটিশ প্রজা গ্রেটবৃটেনে এসে যা; তিনমাস থাকে এবং বৃটীশ নাগরীক হবার জন্য আবেদন করে তবে তাকে বৃটিশ নাগবীক করে নেওয়া হয়। আমিও বৃটিশ নাগরিক হয়ে পুনরায় সেই বয়ের কাজ করেই পৃথিবীটা পুনরায় চক্কর দিয়ে যখন লণ্ডনে ফিরে আসলাম তখন আমার মনে একটি প্রবল বাসনা জেগে উঠল। সেই প্রবল বাসনাটি হল ভূ-পর্যটক রামনাথ বিশ্বাসের সংগে সাক্ষাৎ করা। পৃথিবীর প্রত্যেক বন্দরে গিয়ে তাঁর অনুসন্ধান করেছি, কিন্তু কোথাও তাঁর সন্ধান পাইনি, অবশেষে লণ্ডনের গাওয়ার ষ্ট্রীটে এসে ভারতীয় সংবাদ পত্রগুলি পাঠ করে তারই সম্বন্ধে একটি রিপোর্ট পেলাম, সেই রিপোর্টে ছিল ভূ-পর্যটক রামনাথ বার্লিনে পৌচেছেন সত্বরই হল্যাণ্ড, বেলজিয়াম এবং ফ্রান্স হয়ে ইংল্যাণ্ডে পৌছবেন।

এদিকে আমার শেষ নিশ্বাস ফেলবার সময় অতি কাছে এসেছিল। আমি আমার ডায়রীখানা অতি যত্নে কাছে রেখে ভাবতাম, ভূ-পর্যটক রামনাথ আমার সংগে দেখা করবেনই। তিনি এসেছিলেন তাঁকে আমার ডায়রী সমঝিয়ে দিয়েছিলাম। তিনি আমাকে বলেছিলেন আমার ডায়রী তিনি পুস্তকাকারে প্রকাশ করবেন। তাঁকে আমি বিদায়ও দিয়েছিলাম। আমি জানতাম তাঁর সংগে আমার আর দেখা হবে না। তবুও শান্তি পেয়ে ছিলাম আমার ডায়রী প্রকাশ পাবে

বলে। আমার ডায়রীর শেষ পাতায় হাসপাতালের অধ্যক্ষগণকে লক্ষ্য করে লেখেছিলাম গরীবের দান করার মত অনেক কিছু আছে, সারা-জীবনের পরিশ্রম, গরীব সমাজের কল্যাণে অকাতরে দান করে, আমি তাই করেছি, এমন মরণের পরও কিছু সমাজ দান করা যায় কি না তাই অনেক দিন ভেবে ঠিক করেছি, আমার মরার পর আমার শরীর ধর্ম্মমতে নষ্ট না করে সমাজের ডাক্তারদের দেওয়াই উচিৎ। ডাক্তারগণ আমার শরীর নিয়ে গবেষণা করবে এবং যাতে পৃথিবী হতে ক্ষয়রোগ লোপ পায় তারই চেষ্টা করবে।” এর পর গরীব মজুরের সমাজকে দেবার মত কিছুই থাকবে না।

—শেষ-

ঢাকুরিয়া (২৪ পরগণা) হইতে শ্রীপ্রফুল্ল কুমার বসু কর্ত্তৃক প্রকাশিত
ও উৎপল প্রেসে শ্রীঅনিল কুমার বিশ্বাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত।